সেই ঋত্বিক

সেই ঋত্বিক

সুব্রত রুদ্র
সম্পাদিত

প্রতিভাস □ কলকাতা

SEI RITWIK
A collection of essays on Ritwik Ghatak
Edited By Subrata Rudra

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৮৫

প্রকাশক
বীজেশ সাহা
প্রতিভাস
১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা - ৭০০০০২
দূরভাষ : ২৫৫৭-৮৬৫৯

মুদ্রক
বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্ট বিভাগ)
১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা - ৭০০০০২
দূরভাষ : ৬৫৪৪-৪৮৯৮

প্রচ্ছদ
সুদীপ্ত দত্ত

সূচনা

ঋত্বিককুমার ঘটকের (৪ নভেম্বর ১৯২৫—১৯৭৬) মৃত্যুর পর ন-বছর পার হয়ে গেল। বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হত আজ ষাট। মানুষের প্রতি অগাধ আস্থা, শত প্রতিঘাত হতাশা ব্যর্থতা সত্ত্বেও মানুষের উজ্জ্বল উত্থান—এই বিশ্বাসে দৃঢ় ছিল তাঁর জীবন আর শিল্পকর্ম।

খুব ঘরোয়াভাবে লেখা কয়েকজনের রচনা নিয়ে আমাদের এই বই। এখানে কেবল পাওয়া যাবে কয়েকটি টুকরো স্মৃতি, ঋত্বিকের শিল্পকর্ম সম্পর্কে কিছু চিন্তাভাবনা। আশা করি, আপাত-ছিন্ন এই সূত্রগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর সামগ্রিক জীবনবোধের একটা আভাস পাওয়া যাবে।

নভেম্বর ১৯৮৫ সুব্রত রুদ্র

সূচিপত্র

আমাদের প্রকাশিত সম্পাদকের অন্য বই

রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা (সম্পাদিত)

সত্যজিৎ : জীবন আর শিল্প (সম্পাদিত)

রবীন্দ্রনাথের দিকে (সম্পাদিত)

তিরিশ বছরের কবিতা/দুই বাংলা (সম্পাদিত)

আগুনে কে পোড়াবে তোমাকে (কবিতা)

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

স্মৃতির ছিন্নপত্রে ঋত্বিক

কোনো দলিল-পত্র হাতে না-রেখে শুধু স্মৃতিচারণের ওপর ভিত্তি করে ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে দু-চার কথা লিখছি। ফলে সন তারিখ বা তথ্যগত ব্যাপারে সামান্য হেরফের হওয়াটা স্বাভাবিক। আমি আসামের গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম—আসামেরই লোক আমি। কলকাতায় মাঝে মাঝে এসেছি, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে কলকাতার গণনাট্য সম্পর্কে কিছু বলায় অসুবিধা অনেক।

ঋত্বিককে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি ১৯৫১-৫২ থেকে। রাজনৈতিক কারণে আমার ওপর ওয়ারেন্ট ছিল, তাই আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল ওই সময়টা। তখন আমাদের মিলিত হবার জায়গা ছিল কলকাতায় ভূপতি নন্দীর বাড়ি। গণনাট্যের আড্ডায় বলুন, অফিস বলুন ছিল সেই বাড়িতে। এখানেই তার সঙ্গে পরিচয়, তারপর ঘনিষ্ঠতা। সেসময় আমাদের আর একজন প্রায় নিয়মিত সঙ্গী ছিলেন। তিনি হলেন ডেভিড কোহেন। এই বাড়িতে বসেই সলিলের বেশ কিছু গানের ও নাটকের জন্ম এবং আমারও দু-চারটে গানের জন্ম। দু-চারটে গান আমরা যৌথভাবেও রচনা করেছি। ঋত্বিকও তার প্রথম ছবি 'নাগরিক'-এর স্ক্রিপ্ট এখানে বসেই লেখে। প্রথম থেকেই একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তার লক্ষ করেছিলাম—একটা কিছু মাথায় এলেই সে কলমের আঁচড়ে তাকে একটা রূপ দিতে পারত; সে একদিকে বলত আর একদিকে লিখত।

ঋত্বিকের IPTA-এর যে-দিক সেটাই আমার কাছে বড়ো, সেটা তার চরিত্রের ইতিবাচক দিক। গণনাট্যের আন্দোলনে তার অংশগ্রহণ, তখনকার ভাবনা, তখনকার চিন্তা, ফিল্ম সম্বন্ধে তার বক্তব্য, নাটক সম্বন্ধে তার বক্তব্য না-জানলে, গণনাট্যের সময়কার তার বৈশিষ্ট্যগুলি না-দেখলে ঋত্বিকের পরবর্তী জীবনের অবক্ষয়ের চিত্রটি অনেক বেশি বড়ো হয়ে দেখা দেবে। চলচ্চিত্র জগত হয়তো তার এই দিকটিকেই বড়ো করে দেখে, কিন্তু সাধারণ মানুষ ঠিকই আছে। ঋত্বিকের কৃতকর্ম যতদিন থাকবে লোকে দেখবে, অন্যকিছু বিচার করবে না।

গণনাট্যে যে সংগঠন সমস্যা বা আদর্শগত সংঘাত চলছিল সেসময় তার মধ্যে প্রথমে ঋত্বিক এসে ঢোকেনি, ঢুকেছিল পরে। গণনাট্যে ওকে প্রথম দেখি অভিনয়ের দিক দিয়ে। মধ্য কলকাতার স্কোয়াড, যা ছিল কেন্দ্রীয় স্কোয়াড—সেই স্কোয়াডে উৎপল দত্ত, শোভা

সেন, কালী ব্যানার্জি প্রভৃতি নামকরা অভিনেতারা অভিনয় করতেন। শোভা সেন গণনাট্যের জন্ম থেকেই ছিলেন, আর উৎপল দত্ত শেকসপিয়রের ড্রামা গ্রুপ থেকে গণনাট্যের ড্রামা গ্রুপে সর্বক্ষণের জন্য এসে গেছেন। সে স্কোয়াড থেকে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। সেখানে রঘুপতির ভূমিকায় ঋত্বিকের অভিনয় আমার মনে সবচাইতে বেশি দাগ কাটে। অবিস্মরণীয় সে অভিনয়। যেমন চেহারা—শালপ্রাংশু বাহু, গলা, চলা-বলা, দেহের ভঙ্গি সব দিক দিয়ে সে অভিনয়ের তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন। সেখানেও এর থেকে ভালো অভিনয় হয়েছে কি না সন্দেহ। অনেকের হয়তো অনেক স্মৃতি আছে, কিন্তু আমি ঋত্বিকের সে অভিনয়ের স্মৃতি এখনও ভুলতে পারিনি। সমকালের আর একটি নাটক হচ্ছে গোগোলের 'ইন্সপেক্টর জেনারেল'। নাটকটির বাংলা রূপ দেওয়া হয়েছিল। এবং নাম-টামগুলো এমনভাবে দেওয়া হয়েছিল যে তৎকালীন সরকারকে চিনে নিতে অসুবিধা ছিল না। সেখানে নকল ইন্সপেক্টরের ভূমিকায় ঋত্বিক নেমেছিল। সেখানেও অদ্ভুত ভালো অভিনয় করেছিল ঋত্বিক। দ্বৈত অভিনয়ের রূপটা খুবই ভালো করে ফুটে উঠেছিল। আমার মনে আছে, অভিনেতা হিসেবে সেখানেই আমার ঋত্বিককে প্রথম দেখা।

তারপর ঋত্বিক গণনাট্যের জন্য নাটক লেখে, পরিচালনা করে। 'জ্বালা' ওই নাটকটার নাম। আমি তখন আসামে ছিলাম। এখানে এসে ওর সাফল্য সম্বন্ধে অনেকের কাছেই শুনি। এরপর আরও কয়েকটা নাটক ও করে। 'সাঁকো' হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং দাঙ্গাবাজদের প্রতিরোধ করার ওপর লেখা। এর আগে ভ্রাতৃঘাতী ওই দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে ও অনেক কিছু করেছে। এরপর আমার যেটা মনে আছে সেটা হচ্ছে ওকে বোম্বেতে গণনাট্যের সর্বভারতীয় অধিবেশনে নিয়ে যাই প্রতিনিধি হিসাবে। আমি অবশ্য আসামের প্রতিনিধি ছিলাম। ঋত্বিক 'দলিল' নাটকটা নিয়ে বম্বে যায়। বঙ্গভঙ্গটা, নাটক বলুন, ফিল্ম বলুন, চিন্তা বলুন, ঋত্বিকের সব কিছুর মধ্যে একটা বড়ো ভূমিকা নিত। তার মন যেন ওইখানেই নোঙর বেঁধেছিল। এবং এটা একটা তার obsession-এর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওই নাটকে বাবার পার্ট করে ঋত্বিক নিজে আর মেয়েটির পার্ট করে সলিলের গানের গ্রুপের একটি মেয়ে মমতা। সে এখনও অভিনয় করে বিভিন্ন জায়গায়।

১৯৫৩ সাল বোম্বের অধিবেশন হয়, মস্তবড়ো অধিবেশন। এর আগে অধিবেশন হয়ে গেছে ১৯৪৮ সালে এলাহাবাদে। মাঝখানে অনেক বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটে গেছে; নানা সংগ্রাম, নানা আন্দোলন, তেলেঙ্গানার ঘটনা প্রভৃতি। অনেক ভাঙচুর হয়ে গেছে। বোম্বের অধিবেশনে আবার নতুন করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছিল। সর্বভারতীয় অংশগ্রহণ দারুণ হয়েছিল। এবং সেখানে বোম্বের অংশগ্রহণ ছিল খুবই ভালো। বিমল রায় IPTA-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। ফিল্ম জগতের অনেকেই এসেছিলেন, গানের জগৎ থেকে শচীনদেব বর্মণ, অনিল বিশ্বাস প্রভৃতি সবাই আসতেন, প্রায় রোজই আসতেন। অধিবেশনের সাতদিনই একটা করে নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল—বলরাজ সাহানীর হিন্দি নাটক 'ইন্সপেক্টর জেনারেল', কেরালা থেকে নাটক 'তুমি আমায় কম্যুনিস্ট করেছ', ঋত্বিকের 'দলিল' প্রভৃতি। আমি নির্মলেন্দু চৌধুরীকে নিয়ে গিয়েছিলাম পূর্ব

পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে—সেখানেই সে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পায়। দেখা গেল 'দলিল' মঞ্চায়িত করায় অসুবিধা অনেক—বাংলা ভাষা তো। তখন আমাদের সকলেই অপরিচিত—তাপস সেনও অপরিচিত। সব সাজিয়ে-টাজিয়ে দুটো দৃশ্য হবে। আগে বলে দেওয়া হল, পূর্ব বাংলা থেকে সব কিছু ছেড়ে আসা মানুষের জীবন এবং সেই মানুষের এপার বাংলায় পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণকে কেন্দ্র করে নাটকটা। সমস্ত ব্যাপারটা এবং অভিনয় এমন সুন্দর হয়েছিল, বিশেষ করে বাড়িঘর ছেড়ে আসার সময়ের দৃশ্যটা, যে প্রত্যেকটি অবাঙালি দর্শক পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে সে অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা যেন অন্তর দিয়ে প্রত্যেকটি মুহূর্ত উপলব্ধি করেছেন। মঞ্চের কারিগরিও নিশ্চয় অনেকটা সাহায্য করেছিল। তাপস সেন এবং অন্যান্যদের মঞ্চস্থাপনা সেদিক দিয়ে অতুলনীয় ছিল—মঞ্চের dimension ভেঙে পূর্ববঙ্গের নদী ও মাঠের panorama দর্শকদের সামনে তুলে ধরা, সত্যি কথা বলতে কী বোম্বেতে এটা এর আগে কেউ দেখেনি। নাটকের জাজেদের চেয়ারম্যান বোধহয় ছিলেন বিমল রায়। 'দলিল'কেই ফার্স্ট প্রাইজ দেওয়া হল। প্রথম পুরস্কার পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে বাংলার ক্যাম্পে খুব উল্লাস এবং আমরাও গর্বিত। যতদূর মনে আছে উদয়শংকর প্রাইজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করেছিলেন—এই অধিবেশনের উদ্বোধকই ছিলেন তিনি। প্রাইজটা গ্রহণ করে ঋত্বিক নিজে; তারপর ইংরেজিতে দু-চারটে কথা বলে সে। সে বক্তব্য নেহাত আনুষ্ঠানিক বক্তব্য ছিল না। সেই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সে নাট্য-আন্দোলন—নবনাট্যের গোটা পরিপ্রেক্ষিতটা তুলে ধরে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে গণনাট্যের ভূমিকা। এই প্রসঙ্গে সে বলে যে নাটক কখনও একার প্রচেষ্টায় হয় না, এটা যৌথ দায়িত্বের প্রয়াস এবং এই পুরস্কারে গোটা ইউনিট পুরস্কৃত।

বোম্বের সম্মেলনে অজয় ঘোষ আসতেন এবং নিয়মিতই আসতেন। ওই সম্মেলনটার পরটাতেই তাঁর সঙ্গে আমাদের একটা আলোচনা হয়। আমার মনে হয়েছিল তিনি আমাদের ভুল নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন—তিনি শ্রেণি সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণি সমন্বয়ের পথে আমাদের নিয়ে আসছিলেন। ঋত্বিক তখন গণনাট্যের রাজনৈতিক, আদর্শগত এবং সংগঠনগত বিষয়ে অজয় ঘোষকে লম্বা একটা চিঠি লেখে। গণনাট্য সম্পর্কে তার সে সময়কার চিন্তা এবং তার জন্য কাজ করার আগ্রহ এই চিঠিতে ফুটে উঠেছিল। এই চিঠি মুসাবিদা করার সময় আমি ছিলাম, আমার সঙ্গে আলোচনাও হয়েছিল। কিন্তু content এখন কিছুই মনে নেই। ওই চিঠির প্রাপ্তিসংবাদও আমি জানি। সেসময় ঋত্বিক পার্টিতে ঢোকে—ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্টে।

কলকাতায় ভালো ভালো শিল্পীর অভাব কখনোই ছিল না। কিন্তু গণনাট্য সংস্থায় এসেছে বলে সকলেই তো আর দেবতা ছিলেন না। মধ্যবিত্তসুলভ নাম-যশ-ঈর্ষা-অভিমান-ব্যক্তিস্বার্থের প্রশ্ন বারে বারে এসেছে এবং বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে পরস্পর পরস্পরকে ল্যাং মারামারির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কলকাতা চিরকালই গণসংগঠনের একটা বিস্ফোটক ছিল। আমরা মূলত দেশের সমস্ত লোকের কথা বলি, চাষি-মজুর তো থাকে গ্রামে। তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আমাদের থাকে না; অথচ মার্কস ও লেনিনের নামে যেটা হয় সেটা healthy

competition না হয়ে একটা rivalry হয়ে দাঁড়ায়। গণনাট্য আন্দোলনকে বুঝতে গিয়ে সেখানেই হয়েছে ঋত্বিকের মুশকিল—সে কোনো গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণনাট্যে আসেনি। এরই ছাপ পাওয়া যাবে ওর 'কোমল গান্ধার' ছবিটিতে। সেখানে দাদাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সেল-মিটিং এগুলোই প্রাধান্য পেয়েছে; আন্দোলনের দিকটা, যেটা মূল দিক সেটা স্থান পেল না।

ঋত্বিক তখন হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে থাকে। আমি প্রায়ই আসতাম। হাজরা রোডের মোড়েও আমাদের একটা আড্ডা ছিল। ওখানে সলিলও আসত। গণনাট্যের সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হত। আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি কথা বলতাম। ঋত্বিক আমার কথাগুলোর মূল্য দিত, অবশ্য ওর নিজেরও একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এর আগে সংগঠন নিয়ে ওকে অত ভাবতে দেখিনি। এই সময় IPTA-র সারা বাংলার একটা কনভেনশন ভূপেন বোস অ্যাভিনিউর একটা হলে অনুষ্ঠিত হয়; উদ্দেশ্য ছিল IPTA-কে পুণর্গঠিত করা। সেখানে যে-দলিলটার ওপর আলোচনা হয়েছিল সেটা ছিল ঋত্বিকের ড্রাফ্‌ট করা। কাটাকুটি হয়ে ড্রাফ্‌টার অনেক অদল-বদল হয়েছিল সত্যি কিন্তু ওটা মূলত তারই রচনা। এটা পরে ছাপানো হয়েছিল বলেই আমার মনে আছে।

গণনাট্য সংস্থার মধ্যে ঋত্বিকের যে কয়েকটা বছর কেটেছে সেই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন বলেই মনে হয়। কৃষ্ণনগরে সারা পশ্চিমবাংলার গণনাট্য সম্মেলন হয়। আমি আসামের লোক। তাই ওই সম্মেলনে ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। ওখানে দেখলাম ঋত্বিক নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে স্থান পায়নি। ওর কাছে গিয়ে তখন আমি বললাম, গণনাট্য কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, একটা আন্দোলন। তোমাকে আসতেই হবে। ও কিছুতে যেতে চায়নি, প্রকৃতপক্ষে আমিই জোর করে ওকে সম্মেলনে নিয়ে গিয়ে দর্শক-প্রতিনিধি হিসাবে স্থান করে দিই। কিন্তু এর আগে ও যতটা উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে সে উৎসাহের কোথায় যেন টান পড়েছে।

এ কথা সত্যি—পরবর্তী জীবনে ঋত্বিক গণনাট্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু গণনাট্যের যেটা আদর্শ, যেটা উদ্দেশ্য সেটা সে কোনোদিন ভুলতে পারেনি। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে মাত্র কয়েক বছর আগে তার একটা লেখায়। তার কথায়, "আজকে গণনাট্যের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হয় না। সেখানে দু-একটি আজব কথা ব্যবহার করা হয়—তাদের নাম নবনাট্য সৎনাট্য ইত্যাদি। এ ব্যাপারটাকে আজও পর্যন্ত আমি ধরতে পারিনি।...গণনাট্য কোনোদিন Pessimism নিয়ে ব্যাপৃত ছিল না বরঞ্চ বলিষ্ঠ জীবনবাদের জন্য তারা লড়াই করে গিয়েছিল, যদিও তারা ক্ষণস্থায়ী। Pessimism জীবনের বিপক্ষে। কাজেই এই ধরনের প্রশ্ন উঠতে পারে না যে, গণনাট্য কোনোদিন Pesimism-এর চর্চা করেছে।...আজকের ন্যাকামি আমাব কাছে অসহ্য লাগে। এগুলো শিল্প নয়, বেশিরভাগ বিদেশিদের কাছ থেকে সংগৃহীত। এই করে কতখানি ডাল গলবে তা আমার পক্ষে বোঝা মুশকিল। কিন্তু মহাকাল এদের ক্ষমা করবে না। দিন বদল হচ্ছে, মানুষও এদের ক্ষমা করবে না।" [অভিনয়-দর্পণ, প্রথম বর্ষ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি '৬৯]

এ লেখা থেকে এটাও বোঝা যায়, ঋত্বিক কেন একালের নাট্যসংস্থার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেনি।

বঙ্গভঙ্গের ট্র্যাজেডিটা ঋত্বিককে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। সমাজ ভেঙে পড়া, আজকের দিনের reality সবকিছু ও ওই দৃষ্টি থেকেই দেখত। সে দৃষ্টি থেকেই ও আমাকে গান রচনায় ভীষণভাবে উদ্‌বুদ্ধ করত। আমার ঘরে প্রায়ই আসত। আমি তখন থাকতাম ওয়েলেসলি স্ট্রিটের একটা ঘরে। আত্মগোপন করে থাকতে থাকতেই ধরা পড়ে যাই। কিছুদিন পরেই ছাড়াও পেয়ে যাই, কারণ তখন কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাটা পড়ে গেছে। ওয়েলেসলি স্ট্রিটে আমার ছোটোভাইয়ের বাসা ছিল, সেখানে আশ্রয় নিলাম। সেখানে এসে ঋত্বিক ভীষণভাবে শুনতে চাইত ওইসব গান—'আমার মন কান্দে পদ্মার চরের লাইগ্যা', 'পদ্মা কও কও আমারে'। এসব গানের প্রথম শ্রোতা ঋত্বিকই। আমি ঋত্বিকের লোকসংগীতের প্রতি অনুরাগই শুধু পাইনি—অনেকেরই পেয়েছি—তার উপলব্ধিটা ছিল বড়ো ভালো। সমঝদারিত্ব বলি যেটাকে আমরা সেই সমঝদারিত্ব ছিল ওর বড়ো ভালো। সেসময় সে যে দু-চারজন গায়কের সমালোচনা করত সেটা সে সঠিকভাবেই করত, স্ল্যান্ডারিং নয়। আজকাল আধুনিকীকরণের নামে উচ্চারণে যে sophistication শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে সে তখনই আলোচনা করত আমার সঙ্গে। তার সমঝদারির আর একটি বড়ো প্রমাণ আমাদের সময়ের বিখ্যাত গায়ক ওমর শেখ সম্বন্ধে মন্তব্য। আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ ১৯৪৭-৪৮ সালে আমেদাবাদে। গাইয়ে খুব ভালো—IPTA-র পয়লা নম্বর গাইয়ে। সে গাইত, অভিনয়ও করত একসঙ্গে। একদিন তার সম্বন্ধে ঋত্বিক বলে, 'দেখেছেন হেমাঙ্গদা একটা জিনিস? ও বারে বারে স্টেজে উঠছে অভিনয় করছে কিন্তু ঢংটা একই—হাতটা এভাবে তুলে দেওয়া, ওভাবে তুলে দেওয়া। এখন তো করছে; এখন তার গলা আছে, ক্ষমতা আছে। কিন্তু পরে এটাই stylised হয়ে যাবে। এখন আবেগে যেটা করছে সেটা আর থাকবে না।' এটা আমি তখন লক্ষই করতে পারিনি; কিন্তু পরে দেখলাম ঠিকই তাই। ওমর শেখ শেষবার যখন কলকাতায় এসেছিল, তখন তার গলা আর নেই, অভিনয় করেই শ্রোতাদের ধরে রাখতে চাইছিল। সংগীত সংগীত—অভিনয় তো নয়। আমার ঋত্বিকের কথা মনে পড়েছিল।

আরও একটা কথা মনে পড়ে, দক্ষিণদেশের কথাকলি ঋত্বিককে কীভাবে মুগ্ধ করেছিল: ওই সময়কার কথাকলির যিনি উদ্‌গাতা সেই কবি ভাল্লাথাল একবার কথাকলির দল নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। মেকআপ নেয়, নিয়ে বসে থাকে। তারপরে আস্তে আস্তে মঞ্চে উঠে একটা হাতে ধরা পর্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়, পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে তারপর শুরু করে। সেই discipline-টা—Greenroom discipline-cum-presentation ঋত্বিককে ভীষণভাবে আপসেট করে দেয়। সে শুধু বলেছিল, 'দেখলেন কাণ্ডটা, ওদের showmanaship-টা?'

লোকসংগীত শহরের লোককে দিয়ে গাওয়ালে যে আর লোকসংগীত থাকে না এটা ঋত্বিক বুঝত। কেন হয় না, এটা অনেকেই বুঝতে চায় না—ঋত্বিককে বোঝাতে হয়নি, ওর কান তৈরি ছিল এ ব্যাপারে। সেই কারণে 'নাগরিক' সিনেমায় সে আমাকে নিতে চেয়েছিল—আমাকে দিয়ে গান গাওয়াতে চেয়েছিল। আমি তখন খুবই অসুস্থ, রোগাপটকা। সুতরাং আমি রাজি হলাম না। রাস্তা থেকে প্রায় কুড়িয়ে পাওয়া মহানন্দ দাসকে তখন আমি ঋত্বিককে দিয়েছিলাম। ময়মনসিংহের লোক সে, পথে পথে ভিক্ষা করত। তার সন্ধান পেয়ে আমি তাকে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরেছি। অপূর্ব কণ্ঠ তার, গ্রাম্যতা এবং গ্রাম্য আকুতি তার কণ্ঠের মধ্যে ছিল। ঋত্বিক তার গানে খুব মুগ্ধ হয়েছিল—'নাগরিক'-এ গান গাইয়েছিল, অভিনয় করিয়েছিল কি না জানি না! ওকে নিয়ে আউটডোর শুটিংয়ে গিয়েছিল ঋত্বিক। সেখানে সবাই যখন ক্যাম্পে বিশ্রাম নিতেন তখন মহানন্দকে দিয়ে গান গাওয়ানো হত। ঋত্বিক ওর গলায় 'আমার মন কান্দে পদ্মার চরের লাইগ্যা' গানটা শুনতে ভীষণ ভালোবাসত। এই প্রথম মহানন্দ দাস হাতে কিছু টাকা পেয়েছিল। ঋত্বিকের টাকা তখন খুব কম কিন্তু মহানন্দকে কিছু টাকা দেওয়া উচিত এই বিবেচনাটা তার ছিল।

ছবি করতে হলে মহানন্দের মতো শিল্পীদের দিয়েই গান করানো উচিত—এই বিশ্বাস শুধু 'নাগরিক'-এর সময় নয় পরে যখন চলচ্চিত্রজগতে ঋত্বিক সুপ্রতিষ্ঠিত তখনও ছিল। অনেকের সে বিশ্বাস থাকে না, সেটা চলে গেছে। 'মেঘে ঢাকা তারা' করার সময়ও আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি করে। ফিল্‌ম সম্বন্ধে আমি খুবই shy। তা ছাড়া কোনোরকমে ফিল্‌মে একবার চেহারাটা দেখাব এটাও আমি পছন্দ করি না। এইজন্য বহু শিল্পীকে আমরা হারিয়েছি, নানান অভিজ্ঞতা আমার আছে; সেই কারণে আরও এই অ্যালার্জি। আমি কিছুতেই যেতে চাই না। তখন রণেন রায়চৌধুরী নামে একটা ছেলেকে আমি ঋত্বিককে দিই। রণেনের দাদা আমার বন্ধু—ছবি আঁকত, গানও গাইত। রণেনকে ঋত্বিকের পছন্দ হয়, তার গান খুব ভালো লাগে। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় ওই গানটা, 'কান্দিয়া আকুল হইলাম বব নদীর ফাঁড়ে' তাকে দিয়ে গান গাইয়েছে। একেবারে সিলেটি উচ্চারণ, এটা ঋত্বিকের ভালো লেগেছিল। অন্য কোনো পরিচালক হলে তাকে দিয়ে 'ভব' উচ্চারণ করাতেন, 'বব' নয়, 'ফাঁড়ে' উচ্চারণ করাতেন না, 'পারে' উচ্চারণ করাতেন। সত্যজিৎবাবু হলেও তাই করাতেন। তাঁদের ধারণা ফিল্‌মে না এটা anticlimax হয়ে দাঁড়ায়।

'কোমল গান্ধার' ছবিটার বেলায় আমি আর রেহাই পেলাম না। আমাকে দিয়ে সে গান করাবেই। প্লে-ব্যাকে গান করতেও হয়েছে আমাকে। তবে তার arrangements আমি ভুল করেছি। স্বভাবতই ফিল্‌মের arrangements ছিল এটা। সে দেখেছে picturisation, আমি দেখেছি সুর। এখানে দুজনের বোঝাপড়ার মধ্যে গোলমাল ছিল। মোট কথা আমি এই ছবিটিতে গান করে সন্তুষ্ট হতে পারিনি।

বাজারে আমার নাম আছে, ছবিতে আমার গলাটা দেবার কারণ বোঝা যায়। কিন্তু কত অখ্যাত, অজ্ঞাত গায়ককে ঋত্বিক দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম'—ওর শেষ ছবি, সেখানেও সে নতুন গায়িকা বীণাপাণি রায়চৌধুরীকে নেবার চেষ্টা

করেছিল। আমি তখন সোভিয়েট কনসুলেটের অফিসে কাজ করি—প্রায়ই আসত ঋত্বিক, সব দিন যে সুস্থ থাকত তা নয়। মাঝে মাঝে খুব অসুবিধা হত। একদিন ট্যাক্সি নিয়ে হাজির, আমাকে নিয়ে যাবে। কী ব্যাপার? না, একটা নতুন গলা ও টেপ করে নিয়ে এসেছে; আমাকে শুনতেই হবে। নিভাঁজ একটা বিয়ের গান, এটাকে সে ফিল্‌মে লাগাবে যদি আমি recommend করি। শুনলাম আমি, recommend-ও করলাম। ঋত্বিকের তখন টাকাপয়সা নেই তবুও সে সেই মেয়েকে শিলং থেকে প্লেনে করে নিয়ে এল 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর জন্য। সে মেয়েকে অবশ্য ওই ছবিতে কাজে লাগানো গেল না, কারণ বাংলাদেশের ছবিতে বাইরের শিল্পীদের কাজ দেওয়ায় অসুবিধা ছিল। এই বীণাপাণি রায় চৌধুরীর বিয়ের গানগুলি সে একটা রেকর্ড করায়। সে গানগুলো এখন মাঝে মাঝে বিবিধভারতীতে বাজানো হয়। ঋত্বিকের এই বোধ যে কত বড়ো বোধ সেটা সকলে বুঝবেন না। অন্য যে-কোনো পরিচালক বক্স-অফিস গাইয়ে ছাড়া এই ধরনের নাম না-জানা গাইয়ে দিয়ে আজকাল গান করাতেন না। ঋত্বিক বলত, নাম না-জানা লোকেরা ভালো গায় জানা লোক থেকে, কারণ তারাই লোকসংগীতের প্রধান অভিবক্তা—'they are the exponents of folk-song।' এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমার এখনও মনে আছে। 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য' প্রথম শুনে আমাকে ও বলেছিল, "হাসির গান হিসাবে নয়, এরকম একটা satirical song বাংলার সংগীত জগতে আর হয়নি এর আগে। গ্রামের লোকে যেমন উপভোগ করে শহরের লোকও ঠিক তেমন উপভোগ করে। লোকসংগীতটা আপনি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে এটা সর্বজনীন রূপ পেয়েছে আবার লোকসংগীতের যে-flavour সেটাও রয়েছে।" আমার এমন বহু গান রচনা আছে যেখানে ঋত্বিক বলা যায় একজন অংশগ্রহণকারী। ও এলেই আমাকে ওসব গান শোনাতে হত—ও পাগল ছিল ওইসব গান শোনবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে সে নতুন রচনার তাগিদও দিত।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আইজেনস্টাইন, স্তানিস্লাভস্কি, ব্রেখ্‌ট এইসব নাম কলকাতার elite-সমাজের মুখে মুখেই শুধু ঘুরত। কিন্তু ঋত্বিকের কাছে এইসব নাম শুধু মুখের ব্যাপার নয়, সে পড়ত এবং বুঝত। তারপর তার understanding যা, realisation যা তার ভেতর দিয়ে বলবার চেষ্টা করত। কোনো ধারের প্রশ্ন আসত না তার বেলায়। সেই ১৯৫১-৫২ সালে সোভিয়েট প্রতিনিধি হিসাবে চেরকাসভ এবং পুডোভকিন এসেছিলেন কলকাতায়। সোভিয়েট রাশিয়ার ফিল্‌ম-জগতের পয়লা নম্বর লোক তাঁরা। এই প্রথম কলকাতায় এলেন। সেই সময়টায় সোভিয়েট প্রতিনিধির কলকাতায় আসাটা ছিল দুর্লভ ব্যাপার। সবেমাত্র নেহরু সরকার সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে কিছু কিছু প্রতিনিধি বিনিময় হচ্ছে, এই মাত্র। এখন যেমন হয় সেরকম সরকারি দিক থেকে তাঁদের reception দেবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। চেরকাসভ এবং পুডোভকিন কোনো cultural exchange হিসাবে এসেছিলেন, না আমাদের Friends of Soviet Union, সংক্ষেপে যাকে আমরা FSU বলতাম তার আমন্ত্রণে এসেছিলেন আমার এখন ঠিক মনে নেই। কিন্তু আমাদের সঙ্গেই তাদের বেশি সময় কেটেছিল। উৎপল দত্ত, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন তখন চলচ্চিত্র নিয়ে ভাবতেন,

যদিও তখন পর্যন্ত চলচ্চিত্র নিয়ে তাঁরা কিছু করেননি। তারপরে দেখতাম ঋত্বিককে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায়। আইজেনস্টাইন, পুডোভিকিন এঁদের লেখা ওর খুব ভালো করে পড়া ছিল। এইসব ব্যাপারে তার যথেষ্ট study ছিল এবং বুঝত। এইসময় ভারতবর্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং আমরা প্রথম নাম জানলাম রোজলিনি, ডি-সিকা প্রভৃতি চলচ্চিত্রকারদের আর শিখলাম নিয়োরিয়ালিজম কথাটা। মাঝে মাঝে এক-একটা কথা আসে যা মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আমাদের মার্কসীয় বিচার-বুদ্ধিকে পর্যন্ত ঘোলাটে করে দেয়। তখনই প্রকৃতপক্ষে ফিল্ম সম্বন্ধে কিছু চিন্তাভাবনা শুরু হয়। রোজলিনির 'ওপেন সিটি রোম'-এর resistance movement আমাদের অপূর্ব লেগেছিল, সব নাকি আউটডোরে তোলা, ২৫ দিনের মধ্যে শুটিং শেষ হয়েছিল। কিন্তু ফিল্ম লাইনের কর্তারা সবাই বলতেন, ডি-সিকার 'বাইসাইকেল থিফ' সবচাইতে ভালো। আমরাও বলতাম—হ্যাঁ, এরকম realism হয় না। সেই সময় মৃণাল সেন বা ঋত্বিক ঘটকের মতটাকে আমরা খুব মূল্য দিতাম। আমরা তখন ঋত্বিককেই গণনাট্যের তরফ থেকে representative করলাম ওই চেরকাসভ আর পুডোভকিনের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য। সোভিয়েট প্রতিনিধিরা গণনাট্যের অফিসে এসেছেন একবার নয়, কয়েকবার। আমি, সলিল চৌধুরী আরও কয়েকজন আমরা যারা গ্রুপ হিসাবে ছিলাম তারা তাঁদের গান শুনিয়েছি। তাঁদের সঙ্গে ক্যামেরাম্যান ছিলেন, তিনি একটা শুটিং করেছেন গণনাট্যের 'অহল্যা' নামে একটা নাচের। তখন আমি ঋত্বিকের মধ্যে ফিল্ম সম্বন্ধে একটা চেতনা দেখেছি যেটা অন্য কারও মধ্যে অত বেশি করে ছিল না। মৃণাল সেন ফিল্ম টেকনিক ও ডায়ালেটিকস্ বিষয়ে মৌলিক চিন্তার সূত্রপাত করেছিলেন সেই সময়।

ঋত্বিক ঘটক সত্যি সত্যিই যখন ফিল্ম-জগতে প্রতিষ্ঠিত হল তখন থেকে ক্রমশ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে দূরে সরে গেল। মার্কস ও লেনিনবাদের art ও literature নিয়ে class struggle করব, ideological battle করব, weapon হিসাবে ব্যবহার করব, আগে সে যে-কথা বলত সেখান থেকে সে মুখ ফেরাল এই অর্থে যে সে ইয়ুঙের যে Archetype সেই Archetypal character করবার দিকে ঝুঁকল। তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই archetype শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় আমাদের 'আদ্যাশক্তি'তে। অর্থাৎ আদি image নিয়েই মানুষ আছে। Collective primitive life-এর image-এর নামে সে প্রায় আমাদের তান্ত্রিক সাধনাকে মেনে নিল। ফিল্মে গিয়ে একটা frustration-এ ঋত্বিক ভুগছিল এবং ব্যক্তিজীবনে সে তার চরমে পৌঁছেছিল—সেটা সে গোপন করত না, গোপন করবার প্রয়োজন বোধ করত না। এই তান্ত্রিক জীবনচর্চা তার দৈনন্দিন জীবনকে এক অতি বেদনাদায়ক পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার জন্যই যে ঋত্বিক দূরে সরে গেল এটা ঠিক না। আবার নাম-যশ এইসবের জন্য ফিল্ম করব, এটাও সে করত না।

ঋত্বিক যে-কারণেই ছবি করুক না কেন তার অনুভূতির গভীরতা প্রশ্নাতীত। 'সুবর্ণরেখা' ছবিটার বিষয়বস্তু সম্পর্কে নানা প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু গণিকালয়ে গিয়ে ভাইয়ের বোনের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হওয়া, সেই যে-situation, তারপর আত্মহত্যা, তার যা

intensity এবং তা এমনভাবে এসেছে যে কোথাও মেকি বা তৈরি করা জিনিস বলে মন হয় না। অনেকেই এই ধরনের পরিস্থিতি নিয়ে ছবি করেন, কিন্তু এই intensity-টা তাঁরা আনতে পারেন না, সেটা গিয়ে দাঁড়ায় slander-এ—Slander against our women-folk। যে-generation কলকাতায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, যাদের জন্য কলকাতা বিক্ষোভ-ব্যারিকেড্-মিছিল শহর নামে পরিচিত তারা কি সব মরে গেছে? তাদের চরিত্র কি সব নষ্ট হয়ে গেছে? এ কথাটা কি কেউ বলতে পারেন? তবু ওই slander-টাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এটা আমাদের জাতীয় অপমান। কিন্তু ঋত্বিককে লক্ষ করে দেখবেন, slander নয়; ডস্টয়েভস্কির মতো he is crying for them। তার ছবি মনের মধ্যে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তবু আশার আলো সেখানেও আছে। ছবিটার শেষে মামা ভাগ্নের হাত ধরে চলেছে; তারপর বলছে, 'নদীর পারে চল মামা, এগিয়ে চল সূর্যোদয়ের পথে।'

এই জিনিসটাই লক্ষ করেছি যখন ঋত্বিক আমার বাসার পাশেই একটা মেন্টাল হস্‌পিটালে ছিল। আমি সেখানে যেতাম আগের টানে, ফিল্‌মের টানে নয়। যখন মদ খেত না তখন ও খুবই স্বাভাবিক থাকত এবং অনেক কথাবার্তা আমাদের মধ্যে হত। একদিন আমায় বলে যে, পাগলদের entertainment-এর জন্য গভর্নমেন্ট হসপিটালকে টাকা দেয়। ওই টাকায় কখনও গান-বাজনা, কখনও যাত্রা-থিয়েটার হয়েছে। সুতরাং আমার গানের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সুপারিনটেন্ডেন্টকে সে বলতে তিনি রাজি হলেন। আমিও আমার দলবল নিয়ে গান করতে গেলাম। ওখানে সবাই পাগল, ঋত্বিকও আছে। দু-তিনজন পাগল গান করল খুব ভালো, একজন একটা আবৃত্তি করল, একজন একটা ম্যাজিক দেখাল আর হল ঋত্বিক পরিচালিত একটা ছোটো নাটিকা। অনেকেই জানে না হয়তো যে ঋত্বিক ওখানে একটা নাটক লিখেছিল—psychodrama। সেখানে সে সেটা পাগলদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছিল সেদিন। ওখানে আমি বলেছিলাম—ঋত্বিক তুমি তো 'সুবর্ণরেখা' করেছ, সুবর্ণরেখার এপার দেখিয়েছ। সুবর্ণরেখার আর একটা পার আছে, তার নাম গোপীবল্লভপুর। গোপীবল্লভপুরের reality তুমি ধরবে? তুমি ধরতে পারবে? ও বলেছিল—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমি ভাবব এ নিয়ে। আমার মনে আছে ফেলিক্স গ্রিনের চিনের ওপর বইটা আমি ওখানে ওকে পড়তে দিয়েছিলাম, সে পুরোটা পড়েছিল। ওখানে আমি প্রায় রোজই যেতাম অফিস থেকে এসে খাবার-টাবার নিয়ে। দুপুরের খাবার নিয়ে যেত আমার বাড়ি থেকে। একদিন তো ও রাগ-টাগ করে বলেছিল—কী সব দেন, ইলিশ মাছই দেন না। আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে ইলিশ মাছ, এটা ওটা পাঠিয়ে দিতেন।

এরপর একদিন ঋত্বিক আমার অফিসে এসে হাজির। কী ব্যাপার? না, একটা স্ক্রিপ্ট করেছে আমি যেমন বলেছিলাম তেমন একটা বিষয়ের ওপর। আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করিনি। ওর মাথায় কত কী ঘুরছে। তা ছাড়া আগের একটা ঘটনাও মনে পড়ে গিয়েছিল। ও একটা তথ্যচিত্র করেছিল, 'আমার লেনিন'। সেই তথ্যচিত্রে ঋত্বিক যাঁদের প্রথম সারিতে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে তাঁদের প্রায় সকলেই একটা শোধনবাদী পার্টির নেতা, যাঁরা আজ লেনিনের নাম করে লেনিন-বিরোধী কাজেই বেশি করে নেমেছেন। উপরন্তু গভর্নর

এসে লেনিনের মূর্তি উন্মোচন করলেন এইসব অফিসিয়াল ব্যাপার-ট্যাপারও আছে। তারপর ঋত্বিক নিজের গোঁ অনুযায়ী লেনিনকে নিয়ে চলে গেল গ্রামের কৃষকদের মধ্যে, কৃষকের চোখে দেখা লেনিনই আসল লেনিন হয়ে দাঁড়াল। সেই কারণেই বোধহয় ছবিটা আর এখানে মুক্তির ছাড়পত্র পেল না। যে-লেনিন বিশ্বের মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন সেই লেনিনকে এইসব নেতারা আর এদেশে মুক্তির আলো দেখাতে পারলেন না। ঋত্বিক জীবনের শেষ দিকে এইসব নেতাদের খপ্পরে গিয়েই পড়েছিল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋত্বিকের আত্মসমর্পণের মূলে দেখা যাবে ওই শোধনবাদী পার্টির সঙ্গে তার গ্রন্থি-বন্ধন।

যাই হোক, ওই স্ক্রিপ্টটাই ছিল 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'। ঋত্বিক মুখে মুখে আমাকে শোনাল সমস্তটা। ছবিটা আমার দেখা হয়নি, দেখা হলেই সমস্তটা বুঝব। তবু যতটুকু শুনেছি তা থেকে আমার মনে হয়, this is not a slander against Naxalites. সে নকশালদের ডেনে গেছে, তাদের সঙ্গে তর্ক করেছে, politically তাদের বুঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছে with all sympathy। সেখানে পুলিশের গুলিতেই তার মৃত্যু হয়। এ ছবির ব্যাপারে আমার কোনো দান আছে কি না জানি না; তবে ও যখন মেন্টাল হসপিটালে ছিল তখন আমিই ওকে এ ব্যাপারে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলাম।

জীবনের স্বপক্ষে লড়াই দিয়ে শিল্পী ঋত্বিকের জীবন শুরু। 'Pessimism জীবনের বিপক্ষে...গণনাট্য কোনোদিন pessimism-এর চর্চা করে না।' এটাই ছিল তার মূলমন্ত্র। কিন্তু তার চলচ্চিত্রে দেখলাম সেই pessimism-টাই অনেক বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। কোথায় সেই লড়াই? কোথায় সেই প্রতিরোধ? তবু, তবু বলব ঋত্বিক অনেক বেশি faithful এবং artisitc। অসুস্থ অবস্থাতেও তার হাত দিয়ে যে-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে তার মধ্যেও অসুস্থতার লক্ষণ নেই। ঋত্বিকের এই যে-finer জিনিসগুলি সেগুলি তো তার মধ্যে artistry না-থাকলে হয় না! এই artistry ক-জনের মধ্যে আছে?

সমর সেন

ঋত্বিক ঘটক

১৯৫৫ সালে 'পথের পাঁচালী'। রাত ন-টায় ফিল্ম দেখার আমার অত্যন্ত অনিচ্ছা, কেন-না সন্ধের আড্ডাটা বাদ পড়ে। তবু জোর করে বিরস মুখে দেখতে গিয়েছিলাম 'পথের পাঁচালী'। ফিরেছিলাম প্রায় হতবাক হয়ে। অনেকে বলেন, বিদেশে খ্যাতি হবার আগে 'পথের পাঁচালী-র সমাদর নাকি এদেশে হয়নি। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে, ছবিটি দেখার পর আমরা কয়েকজন বন্ধু চাঁদা তুলে বিশপ লেফ্রয় রোডে আইসিএস অশোক মিত্রের বাড়িতে সত্যজিৎ রায়কে সংবর্ধনা জানাই। সত্যজিৎ রায় পথিকৃৎ নিশ্চয়ই। কিন্তু ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক' অনেক বছর পরে দেখে মনে হল যে, ১৯৫২-তে তোলা ছবিটি আগে মুক্তিলাভ করলে পথিকৃৎ তাঁকেই বলা হত।

অবশ্য ঋত্বিক ঘটক স্টেজ থেকে সিনেমায় যাওয়াতে প্রথম ও অন্যান্য দু-একটি ছবিতে অতিনাটকীয়তা আছে। 'নাগরিক'-এর নানা চরিত্র ও সামাজিক বক্তব্য ঋত্বিকের পরের কয়েকটি ছবিতে নানাভাবে এসেছে—'অযান্ত্রিক' ও 'তিতাস' বাদে। ঋত্বিকের ভঙ্গি প্রখর, সরব, এদিক থেকে 'অযান্ত্রিক' ও 'তিতাস' ব্যতিক্রম। বিরাট পটভূমিকায় তোলা 'তিতাস'-এর মতো ছবি আমাদের দেশে বিরল। ঋত্বিকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যে-অবস্থায় পৌঁছিয়েছিল তখন 'তিতাস' ও অন্তত কয়েকটা অংশে 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'-র মতো ছবি তিনি কীভাবে তুলতে পেরেছিলেন সেটা বিস্ময়কর। সিনেমা তো গল্প কবিতা বা সম্পাদকীয় লেখার ব্যাপার নয়। নিদারুণ শারীরিক বিপর্যয়ের মধ্যেও Flowers of Evil লেখা যায়, কিন্তু সিনেমা একটা জটিল ও যৌথ ব্যাপার, যেখানে সংগঠনের শক্তি থাকা চাই। মাত্র একান্ন বছর বয়সে জীবনের অত্যন্ত যন্ত্রণাকর প্রান্তে এসে ও-ধরনের ছবি যিনি তুলতে পারেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও প্রাণশক্তি অনস্বীকার্য।

ঋত্বিকের বিষয়ে আমার বিবেক দংশন হয়। তাঁর জীবদ্দশায় যখন দেখা হত মাঝে মাঝে, তখন তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম না, একটা নাক-উঁচু ভাব ছিল। গত বছর তিনি মারা যাবার পর (১৯৭৬) তিন-চারটি ছবি দেখে বিস্মিত বোধ করি। বেশ কয়েকজন শিল্পী প্রগতি ভাঙিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ঋত্বিক, অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও, ভেজাল ছিলেন না।

বিজন ভট্টাচার্য

কাপালিক ঋত্বিক

আমি যেমন দেখেছি, শ্রীঋত্বিক, সব সময়ই একটা কিছু 'হয়ে উঠতে' চাইত।

এই হয়ে ওঠাটাই আমাদের অনেকের জীবনে হয়ে ওঠে না। শুধু হয়ে ওঠে না, না, সে সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। অথচ কাল পূর্ণ হলে আমরা সকলেই বেড়ে উঠি, বয়স বাড়ে এবং তার সম্পর্কে কিছু কিঞ্চিৎ অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞতাও। তারপর যখন সময় আসে, মরে যাই। এই মরাটাও ভালো করে মরা হয় না। কালের ওপর এক্তিয়ার নেই বলেই অঙ্গুলিসংকেতে চলে যেতে বাধ্য হই।

এহেন যারা আমরা, তাদের এই হয়ে-ওঠা সম্পর্কে কোনো ধ্যান-ধারণা থাকতে পারে না।

This irresponsible responsible life teaches us nothing। ঋত্বিক ছিল ঠিক এর উলটোটা। Responsibly irresponsible। তাই হয়ে-ওঠাটা, এমনকি মরাটা ধরেও, তার জীবনে ছিল বড়ো রকমের একটা অঙ্কুশ।

ঋত্বিককে আমরা অনেকেই চিনতে পারিনি। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই আমাদের পক্ষে চেনাজানা সম্ভব হয়নি আমাদের বাড়, বেড়ে ওঠার মতো।

ঋত্বিকের সঙ্গে সকলের সমান সান্নিধ্য ছিল না। যাঁদের ছিল, তাঁরা ঋত্বিককে কীভাবে চিনেছিলেন জানি না। তবে সে খানকয়েক ছবি করে গেছে সর্বসাধারণের অবগতির জন্যে। আমার মনে হয়, সেইসব ছবিতে তার এই হয়ে ওঠার জ্বালা-পোড়া লেখাজোখা আছে। এখানেও আবার সেই না-বোঝার কথা, দুর্বোধ্যতার সমস্যা, রামধাক্কার হোঁচট, যে-ব্যাপারটা ঋত্বিকের জীবন ও শিল্পকর্মের সঙ্গে আমাদের না হয়ে-ওঠার সঙ্গে, ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চোখ নেই, কান নেই, তার জানবে বুঝবে কে? ফিল্‌ম করে, ফিল্‌ম ভালোবাসে, সেইসব ফিল্‌মি লোক? জীবন কি শিল্পকর্মের সঙ্গে শঙ্খ ধরে জড়িয়ে দু-ধারে দুই ডঙ্কা তুলে নেই!

সাপের চাদর গায়ে জড়িয়ে কোর্ট-কাছারিতে মামলা জেতা যায়, ছবিও হিট করে, তবু জীবন জড়িয়ে শিল্পকর্ম হয় না। এখানেই হয়ে-ওঠার ব্যাপারটা শঙ্খ ধরা ডঙ্কের মতো—যার হয় তার হয়, যে মাতে সেই মাতে। সে এক গাজনের মাতন। আপামর জনসাধারণকেও সে ছেড়ে কথা বলে না। সে মাতনে সবাই মাতে।

এই হয়ে-ওঠার শেষ নেই। শিল্পকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে এই 'হয়ে-ওঠাই' আজ সমস্ত দুনিয়া জুড়ে প্রগতিশীল মানুষের একমাত্র কামনা। শিল্পস্বাধীনতার বীজমন্ত্র এই হয়ে-ওঠা। এই মন্ত্র আবার সামগ্রিক সচেতন মানুষের কার্যকর প্রয়োগেব সঙ্গে বিচিত্র এক সাপে-নেউলে খেলা। যে-খেলার নেশা ঋত্বিককে পেয়ে বসেছিল। যেমনটি খেলেছিল তার বুদ্ধি-ক্ষমতা মতো ততটুকুই মেতেছিল, ততটুকুই পেয়েছিল। এর বাড়তি কোনো কথা নেই।

কথা আছে, আমাদের এই না হয়ে-ওঠা স্তরের মানুষকে নিয়ে। অবস্থা বৈগুণ্যে যাদের এই হয়ে-ওঠাটা কার্যকারণবশত সম্ভবপর হয়নি। নেহাতই খেটে-খাওয়া অভাবী স্বভাবী মানুষ যারা আমি তাদের কথা বলছি না। এ কথা তাদের কাছে পৌঁছোবে না। দৈবাৎ যদি কেউ কিনে পড়েন তো সে আলাদা কথা। আমি বলছি সাক্ষরবৃত্তে আঁতেল দাঁতালদের কথা। অথবা সেইসব 'ঘ্যাম'দের মধ্যমণি করে আমরা যারা দলগতভাবে শিল্পের স্বপক্ষে বারোয়ারি করি।

প্রশ্ন থাকে, এই বারোয়ারি কার বারোয়ারি? জনগণ তো নির্গুণ ব্রহ্ম। জনগণের নাম করেই সব বারোয়ারি কর্মের আচার-অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করতে হয়। এটা তো প্রথাগত। কিন্তু যেহেতু এই হয়ে-ওঠার প্রশ্নটির সঙ্গে, দেশের শিল্প-সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ—সে যে মাধ্যমেই হোক না কেন,—বারোয়ারিসূত্রে তাবৎ জনসাধারণের শিল্পজ্ঞানের মান, তথা সামগ্রিক চারুকলা-শিল্পের ক্রমবর্ধমান উন্নতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিধৃত, তখন এই প্রত্যেকটি শিল্পসংস্থার উদ্যোক্তাদের শিল্পসঙ্গত competence থাকা বা শিল্পানুগভাবে হয়ে-ওঠাটা একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয় নয় কি?

প্রিয়, সত্যিই ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।

শঙ্কা এখানেও দিকে দিকে। শয়তান এখানেও শিয়রে দাঁড়িয়ে। এই অবস্থায় বারোয়ারিতলায় শিল্পসংগতভাবে আমাদেব মানানসই হয়ে দাঁড়াতে আর কতদিন লাগবে? আমরা কতদিনে ঋত্বিকের শিল্পগত সংগ্রামের দোসর হতে পারব? এই জিজ্ঞাসার নিরিখেই কি আমাদের এই চক্রাকার অভিযানের হয়ে-ওঠাটা সাব্যস্ত হওয়া সমীচীন হবে না?

আমাদের হয়ে না-উঠতে পারলে সর্বশক্তিধর জনসাধারণও কিন্তু আরও বহু বর্ষকাল শিল্পগতভাবে অর্বাচীন থেকে যাবে। শিল্পসম্মতবোধ যে মহাদেশীয় জীবনে সমুদ্রের জোয়ার আনতে পারত, আমাদের অনীহা ও অকর্মণ্যতার কারণে কিন্তু সেই মহাজীবনে মরা নদীর অভিশাপ ডেকে আনবে। সেই দায়দায়িত্ব আমাদের ওপরেই একান্তভাবে এসে পড়ছে।

আমাদের দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা চলচ্চিত্র ব্যাবসায়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে এখনও জ্ঞান-অজ্ঞানে বাদ সাধছেন। কেউ কেউ ভাবেন, তিনি বাজার বোঝেন। কিন্তু তিনি জানেন না যে, তরিতরকারি আর মাছের বাজার আর ছবির বাজার এক নয়! কাঁচামালের সঙ্গে শিল্পগত প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে বলে demand, supply-এর ব্যাপারটাও একটা qualitative valuation-এর অপেক্ষা রাখে। এ বাজার বাড়াতে হলে মানুষের মনের

পরিসরে acreage বাড়িয়ে যেতে হবে। এই জমিতেও fertiliser দিতে হয়। তবেই এই জমিতে ফলন হলে বাজার বাড়ে। নইলে বন্ধ্যাত্বের কারণে মন্দা। সর্বাঙ্গীণ মন্দা।

ভাবের ভাবে চললে ইজ্জতও থাকবে না, বাজারও চলবে না। অবশ্যই এই প্রশ্নটি দেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক প্রশ্ন ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ওপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। আগাছা করে সঠিক মূল্যায়ন হবে না। কিন্তু এই হবে না বলেই লুটেপুটে খেতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবারও কোনো মানে নেই।

ছবির ব্যাবসায়ে এই ফাটকা মনোবৃত্তি শিল্প-ব্যাবসায়ে আখেরে কোনো কাজের হয় না। হচ্ছেও না। সরকারি বা আধা সরকারি, সেন্সর,—ফিল্ম ব্যাবসায়ে টাকার বিনিয়োগ ও তার exploitation. (যথাযোগ্যভাবে) যদি না এখনই বলবৎ করা হয়, ছবির বাজারের উন্নতি সুদূরপরাহত। কী স্বদেশে, কী বিদেশে, ছবির কোনো ভবিষ্যৎ নেই যদি না আমরা চলন পালটাই। ভেতর বাজারে কী বাইরের বাজারে, আমাদের পড়ে পড়ে শুধু মারই খেতে হবে।

সরকারেরই দায়; সরকারকেই হয়তো অন্য আর পাঁচটা ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মতো film industry-র দায়ভারও একদিন তুলে নিতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে বেসরকারিভাবেও এই film industry-র কল্যাণ কামনায় আমাদেরও কিছু ভাববার করবার ছিল। এ সম্পর্কে Film Federation-এর বিভিন্ন সংস্থাগুলির দায়দায়িত্ব অস্বীকার করবার নয়। গঠনমূলক কার্যকর পদ্ধতিতে, (একমাত্র কতকগুলি তথাকথিত বিখ্যাত সুখ্যাত দুর্বোধ্য ছবির পরিবেশন ছাড়া) দেশের ও দশের মধ্যে একটা মানসিকতা তৈরি করবার খাতিরে, মন ও চোখ তৈরি করবার খাতিরে, ফিল্ম-ব্যাবসায়ে লিপ্ত শত শত কারিগর শ্রেণিভুক্ত খেটে খাওয়া লোকদের technically equip করবার খাতিরে, এ পর্যন্ত সুসংবদ্ধ কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হল না। অথচ দেখেছি এহেন কার্যকর পদ্ধতিতে কারও কোনো অনীহা নেই। অথচ সামগ্রিক একটা সামুদ্রিক অনীহায় সব শুভ ইচ্ছাই আমাদের ধুয়েমুছে যায়—যেমন যায় ঘরবাড়ি, গোরুবাছুর, সাংবৎসরিক বন্যায়।

পুনার মতো আর একটা ফিল্ম ইন্সটিটিউট কি পশ্চিমবঙ্গে হতে পাবে না? আমাদের গৌরব এক সত্যজিৎ রায়। কিন্তু তিনি একান্তভাবে আমাদের হয়েই বা আমরা কী পেলাম? কুয়োর ব্যাঙের মতো এখনও আমরা নিজের আবেশে মোহাচ্ছন্ন। কী হবে ধরে করে? সেই অনীহা। নিজেদের অক্ষমতার দরুন আত্মঘাতী এক স্বাতন্ত্র্যাভিমান। তিনি আর কী করবেন? না, তিনিই পারেন। তিনিই করবেন। আমরা কিছু পারিটারি না। ফিল্ম language-এর কচকচি আর jargan ছেড়ে দিয়ে এই অকপট মনোভাব নিয়ে সত্যজিৎবাবুকে বাধ্য করতে হবে সামগ্রিক মঙ্গলার্থে এদিকে পা বাড়াবার। সবাই থাকবেন, কিন্তু পদযাত্রা শুরু হবে তাঁকে অগ্রবর্তী করে। আমি জানি সত্যজিৎবাবু মাথায়ই বড়ো না. কাজেও বড়ো। এর আগে শিল্প সংস্কৃতির বৃহত্তর দায়ে তিনি শিল্পীদের পক্ষ থেকে অনেক কিছু করেছেন। সামগ্রিক অনীহায় আমরা যদি না অবসন্ন হই, তিনি আবার করবেন। এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও কাজের দিক থেকে আমরা মৃণাল সেনকেও পেতে চাই। তাঁর ছবির রাজ্যের রীতিনীতিবোধ ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট কাজে লাগবে।

শুভানুধ্যায়ী সহযাত্রী পরিচালক যাঁরা আছেন, এ কাজে তাঁরাও হাত লাগাবেন। কারণ আমাদের পাওয়ার অপেক্ষার চাওয়াটা এক। গন্তব্যস্থল এক। এবং ঋত্বিক সম্পর্কিত শিল্পকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আমাদের সকলের 'হয়ে-ওঠা'র ব্যাপারটার সঙ্গেও বিষয়টি জড়িত। উদীয়মান চিত্রনির্মাতাগণ ও টেক্‌নিসিয়ানরাই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। আগের যুগের চাইতে তাঁরা যদিও এখন খুবই সজাগ, কতকটা বুদ্ধিদীপ্ত, পরিপোষণার অভাবে তাঁরাও পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন এঁদের সমস্যা মিটবে বলে মনে হয় না।

চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে আর এক শ্রেণি আছেন যাঁদের নাম প্রোযোজক বা প্রোডিউসার। ছবির ব্যাবসায়ে এঁরাও প্রায় সমান দুর্গত। কেন-না পরিবেশকশ্রেণির আনুকুল্য ছাড়া এঁরা ছবির কাজে এগুতে পারেন না। অনেক টাকার হ্যাপা। কিন্তু এখানে আবার শুনি, সবাই ফালতু। পরিবেশকও শক্তিমান নন। যদিও অনেক পরিবেশক লাঙলে হাত রেখে প্রোডিউসার সেজে বসেছেন, তিনি মুখ চেয়ে থাকেন ফিনান্সারের। ছবির কারবারে যিনি টাকা লাগিয়ে খাটান। হুণ্ডির খেলা খেলেন। শেষটায় গল্পের গোরু গাছে গিয়ে ওঠে ফাটকায়। সে অরূপরতনের হাতে তাবৎ শিল্প—form আর content, image সমেত টিকি বাঁধা।

এই অনর্থ শোধন করতে পারেন এক জনসাধারণ। জাগ্রত এক জনগণ বা তার প্রতীকী সরকার। এ বিষয়ে film centre-গুলোর দায়দায়িত্ব আংশিক হলেও আছে বই কি।

একটু হয়তো অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু না উল্লেখ করাটা বোধহয় অন্যায় হবে, আমাদের দেশের চিত্রনির্মাতারা বাস্তব জীবন ও সত্য নিরূপণে পরাঙ্মুখ। গুণতিতেই আসে না। Object, objectivity, matter in motion—এ সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণাই নেই। স্পিড স্পিড করে চেঁচান কিন্তু চিত্রপরম্পরার ঘাত-পরিঘাতে চিত্রকল্পের মাধ্যমে image-গত তার যে function, সেটা হয়টয় না। হয় কতকগুলো nostalgic banal প্রতিফলন, সে গেঁটেবাতে স্রষ্টাই অবসন্নপ্রায়। ক্যামেরাটা মনে হয় গলগ্রহ। সবকটা লেন্স মরা। ব্যাপারটা এই যে, স্রষ্টার হয়ে-ওঠার সঙ্গে ক্যামেরা ও লেন্সের হয়ে ওঠাউঠি এখানে একান্তভাবেই নির্ভরশীল। কথকতা কথকতাই, ফিল্‌ম আলাদা। এখানে আরও সমস্যা এই যে, ভালো ভালো বিশ্ববিখ্যাত ফিল্‌ম দেখলেও ভালো ফিল্‌ম করা যায় না। চুরি যে করবেন, তারও তো একটা হিম্মত দরকার! ছবি করেন বলেই কি 'পোটেমকিন্' আইসেন্‌স্টাইন হওয়া যায়, সেতার বাজাই বলেই কি প্রারম্ভিক ভিঁ রি চি চি টেনে আমি সেতার বাজাতে পারি? ভীমসেন যোশীর গান আপনার কণ্ঠে হবে? হয়ে উঠতে হবে তো সেইভাবে নিজেকে, নিজের স্বভাবে!

মোট কথা পরিবর্তন করবার ইচ্ছা থাকলেই পরিবর্তন করা যায় না। ব্যাপারটা আদৌ সহজ নয়। পরিবর্ধনের পথে পরিবর্তন করতে করতে পরিবর্তে নিজেকেও বদলে ফেলতে হয়। তখন perspective আসে নতুন করে। নইলে ইতালীয় বাস্তবতা চুরি করতে গিয়ে ছবি হয় photography। No-Film।

বাস্তববাদী ছবি আমাদের দেশে খুবই কম। নেই বললেই চলে। যা চলে nostalgic অবক্ষয়িত্ব জীবনের সুখদুঃখ বিজড়িত গীতিময় কথকতা।

ছবির ব্যাবসায়ে যিনি টাকা লগ্নি করেছেন, তিনি তাঁর উসুল চান। আর এই জমিতেই পরে চাষের সুযোগ হতে পারে জেনে পরিচালক বর্গাদার-জোতদারের প্রশ্রয়েই প্রশ্রয় পান মানসম্ভ্রম দায়িত্ব ভুলে। নায়ক থেকে গায়ক, সব একসূত্রে বাঁধা। জীবনচিত্র এক, ছবির চিত্র আর এক। মাঝখানে এস্টাবলিশমেন্ট, ব্যুরোক্রেসি, জোতদার, নিরুপায় পরিচালক—বর্গাদার—যে যার ঢোল-কাঁসি বাজায়।

প্রচণ্ড এই প্রতিক্রিয়াশীলতার মাঝখানে ঋত্বিকের ছবিতে কিন্তু কোনো অবক্ষয়ের নজির নেই। শ্মশানের মাঝখানে বসে কাপালিক ঋত্বিককে কি আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি?

ঋত্বিক খেলো মদ আর বিষক্রিয়া হল আমাদের। এখনও প্রলাপ। শত আলাপ। মাঝখানে হঠাৎ একদিন চেয়ে দেখি করোটি ও কারণ নিয়ে ঋত্বিক আর শবাসনে বসে নেই।

শ্মশান ছেড়ে পালিয়েছে কাপালিক।

পরিতোষ সেন

বাঙালি কালচার ও ঋত্বিক ঘটক

"The greatest enemy of art is the collective mind in any of its manifestations. The collective mind is like water that seeks lowest level of gravity."—হার্বার্ট রিড এ কথাটি প্রধানত ললিতকলা প্রসঙ্গেই বলেছিলেন। আমার মতে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে। সে কথায় পরে আসছি। ফিগারেটিভ শিল্পের সঙ্গে ছায়াছবির একটা জায়গায় তো মিল আছেই—দুই-ই ইমেজভিত্তিক। তা ছাড়া রঙের ব্যাপার তো আছেই। তুলনাটি অবশ্য এখানেই শেষ।

চিত্রশিল্পেই হোক আর রুপালি পর্দায়ই হোক এইসব ইমেজ আমাদের কিছু বলে। অন্তত বলা উচিত, সেটা যে-স্তরেই হোক না কেন। কোনো সার্থক শিল্পসৃষ্টি তখনই হয় যখন ইমোশনাল, ইস্‌থেটিক, ইন্টেলেকচুয়াল, টেকনিক্যাল—এই চার স্তরেই আমাদের ধাক্কা দেয়। চিত্রশিল্পের চাইতে চলচ্চিত্রে ইমেজের বলবার ক্ষমতা অনেক বেশি। পরপর চলমান ইমেজের গতি সৃষ্টি করে এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি 'কাহিনি' বলবার ক্ষমতা আর কোনো শিল্পের আছে কি? যে-কাহিনিতে দরকার হলে ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ—তিন কালকে একই সঙ্গে এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে বেঁধে রাখতে পারে?

ছবির ইমেজের সঙ্গে তাঁর কনটেন্টের যে অবিচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে এবং এই কনটেন্টই যে ছবির স্টাইল এবং ইমেজ দুই-ই নির্ধারিত করে এ কথা আর নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই।

ঋত্বিকবাবুর সমাজচেতনা এবং রাজনৈতিক মতামতও আমাদের ভালো করে জানা আছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে এ চেতনা কি উনিই প্রথম এনেছিলেন? আমার সঠিক জানা নেই। বিমল রায়ের কোনো কোনো ছবিতে এর কিঞ্চিৎ আভাস থাকলেও সেগুলো এ আলোচনার আওতার বাইরে কারণ সেগুলোতে এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালুর ওপরই জোর ছিল বেশি। সেখানে কমিটমেন্টের কোনো বালাই-ই ছিল না, জোরদার বক্তব্য সর্বসাধারণের সামনে পেশ করবার পক্ষে চলচ্চিত্র শিল্প যে সবচাইতে শক্তিশালী মাধ্যম, ঋত্বিকবাবুর কাছে এ কথাটা খুব পরিষ্কার ছিল।

'কমিটেড ফিল্ম' বলতে আমরা যা বুঝি ওঁর ছবিতেই আমরা তার প্রথম আভাস পাই। সিনেমা এমন একটা ব্যয়বহুল শিল্প যে নিজের সঞ্চয় খরচ করে দর্শকের চিত্তবিনোদনের এবং লাভলোকসানের কথা না-ভেবে ছবি তৈরি করবার ক্ষমতা পৃথিবীর খুব কম লোকেরই আছে। তারপর আমাদের বাংলা ছবির বাজার এতই সংকীর্ণ, ছবি তৈরি করতে যে-টাকা ব্যয় হল অন্তত সেই টাকাটা ঘরে না ফিরে এলে সেই সঙ্গে পরিচালকেরও গণেশ ওলটাবার আশঙ্কা খুবই বেশি থেকে যায়, লাভলোকসানের হিসেবটা এতই বেশি যে, ছায়াছবির শিল্পে কোনোপ্রকার কম্প্রোমাইজ না-করে ছবি করা প্রায় দুঃসাধ্য বলা যেতে পারে। সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছামতো ছবি করার স্বাধীনতা আছে এমন পরিচালক আমাদের দেশে দু-একজনই আছেন। প্রযোজকের কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে, সে টাকাটা সুদে না হোক অন্তত আসলে ফিরে আসুক —এ বিবেচনা এমন ভাগ্যবান পরিচালকদের মনের অবচেতনে ঘোরাফেরা করে কি না তাই বা কে জানে? ছবি মার খেলে, বিশেষ করে যদি পরপর এরকম দু-তিনটি ঘটনা ঘটে তাহলে প্রযোজকরা তাঁকে দিয়ে ছবি করাতে যে আর এগিয়ে আসবেন না তা তাঁদের ভালো করেই জানা আছে। আমরা কি কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিলাম যে, 'রশোমন'-এর সৃষ্টিকর্তা কুরোসাওয়াকে একদিন এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হবে? চরম ব্যর্থতার অসহ্য যন্ত্রণায় দাপাদাপি করে তাঁকে যে একদিন আত্মহত্যার কথা ভাবতে হবে, আজ থেকে বিশ বছর আগে জ্যোতিষী এ ভবিষ্যৎবাণী করতে পেরেছিল কি? যতদূর খবর পাই আজ জাপানে পরনোগ্রাফিক ফিল্ম-এর এত চাহিদা বেড়েছে যে ভালো ভালো পরিচালকেরাও এটি বাদ দিয়ে ছবি করতে পারছেন না। সেখানকার টেলিভিশন-এ হার্ড কোর পরনোগ্রাফি দেখে ইউরোপ, আমেরিকার লোকেরাও নাকি হকচকিয়ে যান।

স্মরণ রাখা ভালো এই স্বাধীনতার প্রধান কারণ বিদেশে তাদের খ্যাতি। ঋত্বিকবাবুর কপালে এই খ্যাতিই বা জুটল কোথায়? ছায়াছবির পরিচালকই হোন বা চিত্রশিল্পী অথবা ভাস্করই হোন---আমাদের এমন পোড়াকপাল যে সাহেবদের প্রশংসা না পাওয়া পর্যন্ত স্বদেশে তাঁরা তেমন কদর পান না। ভাস্কর রামকিংকর বেইজ আজও শান্তিনিকেতনের এক কোণে ধুকধুক করছেন। ইউরোপ অথবা আমেরিকা হলে ওঁর শিল্পী-জীবন এবং শরীর মন শুধু অব্যাহত এবং সুস্থই থাকত না, প্রচুর খ্যাতির সঙ্গে মাথা উঁচু রেখে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন কাটাতে পারতেন। ভেবে দেখুন কলকাতা শহরে তাঁর শিল্পের একটিও পরিচয় নেই; লন্ডন শহরে এপস্টাইন বা হেনরি মুরের কিংবা প্যারিস শহরে রদ্যাঁ মূর্তি নেই—এ যেন অনেকটা সেইরকম। এখানে আমাদের দেশের বাস্তব চেহারাটা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। সত্যিকার শিল্পের স্থান কিংবা চাহিদা আমাদের সমাজে আছে কি? বাঙালি সংস্কৃতির মান, বাঙালির মূল্যবোধগুলোই বা কী? আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এ শহরে রাজকাপুরের 'ববি' নামক সমাজবিরোধী এবং সংস্কৃতিবিরোধী ছবি পঁচাত্তর সপ্তাহেরও বেশি চলেছে। 'শোলে' যে এ রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে তাতেও আর কোনো সন্দেহ নেই। ওপরের কথা দুটি এ জন্যই বললাম যে, 'ববি'তে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির যে-ছবি দেখানো হয়েছে সেটার সঙ্গে বাস্তবের কোথাও কোনোরকম মিল

নেই। আমাদের লোকসংগীত এবং নৃত্য—তার মান যতই নামুক—এখনও অশ্লীল হয়ে ওঠেনি। সেই ছবির মাথামুণ্ডহীন গল্প, পোশাক, কথাবার্তা এবং চরিত্রায়নে জনপ্রিয়তার খাতিরে সবকিছু এমনই ঠুনকোভাবে দেখানো হয়েছে যে তাকে সংস্কৃতিবিরোধী বললে একটুও বাড়াবাড়ি হবে না। তা ছাড়া দর্শকদের শাকসবজির মতো চেতনাহীন, বুদ্ধিহীন. ভোঁতা ইত্যাদি বলে ধরে নেওয়া এক অর্থে সমাজবিরোধী তো বটেই।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে হাজার হাজার দর্শকরা তাহলে কেন ওই ছবি দেখতে যান? একবার দু-বার নয়, অনেক ছেলেমেয়েরা তিন-চারবারও দেখেছেন। তার জবাব এই, যে-দেশে ফুটবল খেলা হিংস্রতার স্যাডিজম্ এবং নানারকম ক্রাইমের ছবি দেখাই বেশিরভাগ দর্শকদের (বিশেষ করে অল্পবয়সিদের) চিত্তবিনোদনের সবচাইতে বাঞ্ছিত উপায় এবং যে দেশের যুবক-যুবতিদের অবাধ মেলামেশার সুযোগের অভাবে সেক্স একটা অবসেশান হয়ে দাঁড়িয়েছে, দিনের পর দিন যাঁরা এই ধরনের ছবি দেখে সাময়িক আনন্দ পাবেন, যাঁরা চিৎকার, চেঁচামেচি, লাউডস্পিকার ছাড়া থাকতে পারেন না তাঁদের সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলি যে আস্তে আস্তে ভোঁতা হয়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? হিন্দি ছবির দর্শকদের শতকরা যাট-পঁয়ষট্টি ভাগই আজ বাঙালি। বাঙালি মধ্যবিত্তের—তা সে নিম্নই হোক, মধ্যই হোক, উচ্চই হোক—বোরডোম যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তার একটা উদাহরণ না-দিয়ে পারছি না, কিছুদিন আগে এক শিক্ষিত দম্পতি—দুজনেই মোটামুটি ভালো চাকরিবাকরি করেন. তা ছাড়া বেশ কিছু বাড়িভাড়াও পান, আমাদের বাড়িতে নানারকম লোকজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের আনাগোনা দেখে একদিন বলেই ফেললেন যে. "আপনাদের দেখে বড্ড হিংসা হয়— সন্ধ্যাবেলাগুলো আপনাদের চমৎকার কাটে, আর লোকজন না এলেই বা কী! আপনারা দুজন দিব্বি লেখাপড়া কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন ইত্যাদি। আমরা কি করি জানেন? রাত্তিরে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে দুজন নাইট শো-এসিনেমা দেখতে চলে যাই।"—ভাবুন কী অবস্থা। বলাবাহুল্য সব বাঙালি দম্পতির রোজ সিনেমা দেখার মতো সচ্ছল অবস্থা নেই। কিন্তু বোরডোম কাটাবার সবচেয়ে বাঞ্ছিত উপায় সবার পক্ষে ওই একটিই। এরপর যখন ঘরে ঘরে টেলিভিশন আসবে তখন তো আর কথাই নেই। দিনরাত্রি ওই ইডিয়ট বক্সটির পর্দায় আমাদের চোখ আটকে থাকবে।

মধ্যবিত্ত বাড়িঘরের চেহারা দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। কৃষ্ণনগরের তৈরি 'ফটোগ্রাফের মতো জ্যান্ত'—মাটির পুতুল, আরশোলা, টিকিটিকি থেকে আরম্ভ করে—কলা, আম, জাম—কাঠের আলমারিতে অতি সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়—তা ছাড়া প্লাস্টিকের ফুল তো আছেই। আমাদের অতি নিজস্ব পোড়ামাটি এবং কাঠের তৈরি ভাস্কর্যের এবং পুতুল শিল্পের অমূল্য ঐতিহ্য এখন তো প্রায় লুপ্তই বলা যেতে পারে। মৃত্তিকাররাই আজ ভাস্করের স্থান নিয়েছে। ফলে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ বিবেকানন্দ ইত্যাদির এমন সব মূর্তি চারদিকে বসানো হচ্ছে যে তার না আছে প্রোপোরশান, না আছে অ্যানাটমি—না আছে কোনো নান্দনিক মূল্য। এই ধরনের বিশ্রী মূর্তিগুলো সংখ্যায় দিন দিন যে বেড়েই চলেছে তার আরেকটা কারণ যেসব কর্তাব্যক্তিরা

এইসব মূর্তি তৈরি করার আদেশ দেন এবং অনুমোদন করেন তাঁরা নিজেরাও যে আকাট মূর্খ এবং সবরকম সূক্ষ্ম অনুভূতিহীন।

আমাদের লোকশিল্পের চমৎকার উৎকর্ষ এবং বিকাশ—দুর্গা, সরস্বতী এবং কালী ঠাকুরের—আঙ্গিক ও আকৃতি আজ পাড়ার মাস্তানদের বিকৃত রুচিসম্মত হয়ে দাঁড়িয়েছে চলতি জনপ্রিয় সিনেমা স্টারদের মতো, পাড়ায় পাড়ায় লোহালক্কড়, সাবান তেলের ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মতো রবীন্দ্রসংগীত ইন্ডাস্ট্রিজের দারুণ লাভজনক ব্যাবসা চলেছে। এসবই রবীন্দ্র-কাব্যগীতি এবং সঙ্গীতের নামে। ঘরে ঘরে বাঙালি মেয়েরা হাওয়াইয়ান গিটার চর্চা করছেন, চুলোয় গেল সেতার, এস্রাজ ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যের মানই বা আজ কী? আগাগোড়াই চুটকিবাজি। পূজার বাজারে এই চুটকিবাজি করে কত বেশি টাকা পাওয়া যায় বেশিরভাগ তথাকথিত নামকরা লেখকরা এক বছর আগে থেকেই তার পায়তারা কষতে থাকেন। আমাদের সাহিত্যিক ভণ্ডামিরও আর শেষ নেই। জনপ্রিয় সিনেমার কাগজগুলিতে সিনেমার ওপর কোনো আলোচনা কিংবা বিশ্লেষণ নেই—আছে চতুর্থ শ্রেণির গল্পো আর উপন্যাস। স্টারদের কেচ্ছা-কাহিনি। বাঙালি গিন্নিদের দুপুরবেলার বোরডোম কাটাবার ব্যবস্থা। এক কথায় আফিমখোরের দৈনিক ভোজ! আজ যেদিকে তাকাই সেদিকেই বাঙালি সংস্কৃতির এই বিষণ্ণ চিত্র। চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, সংগীত, সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র সবেরই এক অবস্থা এর জবাবে অনেকে বলবেন যে, কেন? আমাদের আছে সত্যজিৎ রায়, রবিশংকর, আলি আকবর।

গোটা ভারতের লোকসংখ্যা এখন প্রায় ষাট কোটি। ইতালির লোকসংখ্যা নাকি পাঁচ কোটি, ফ্রান্সের তো আরও কম, অর্থাৎ আমাদের জনসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগও না। সিনেমার ক্ষেত্রেই দেখুন বাঘা বাঘা কতকগুলো নাম পাওয়া যায় : ফেলিনি, আন্তনিওনি, পাসোলিনি, অলমি, বার্তোলুচি, ব্রেস, ক্রুফো, গদার, লুই মাল, কস্টা গাভরাস্ ইত্যাদি। আমি শুধু তাদেরই নাম বললাম যাদের যশ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সংগীত, নৃত্য, বিশেষ করে সাহিত্য এবং ললিতকলার ক্ষেত্রে কত নামেরই তো উল্লেখ করা যায় যাদের জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শিল্পে সমাজবিদ্যাগত আর দু-একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

ললিতকলা আকাদেমির বার্ষিক প্রদর্শনীতে কোনো না-কোনো বছরে অংশগ্রহণ করেছেন এমন শিল্পীর সংখ্যা আকাদেমির লিস্ট অনুযায়ী প্রায় বারোশো। ধরে নিচ্ছি তা ছাড়াও আরও তিনশো আর্টিস্ট এই লিস্টের বাইরে আছেন। মোট পনেরোশো, খুব বেশি হলে না হয় দু-হাজারই হবে। এক প্যারিস শহরেই পঞ্চাশ হাজারের ওপর আর্টিস্ট আছেন, আমার হিসাবমতো সারা ভারতে সর্বসাকুল্যে মোট বারোজন আর্টিস্ট শুধু ছবি বিক্রি করে অর্থাৎ চাকরি না-করে, মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যে থেকে ছবি এঁকে যেতে পারছেন। এঁদের মধ্যে দুজন কি তিনজন ছাড়া বাকি সবাই ছবি বিক্রি করবার ইচ্ছায় ক্রেতা আকর্ষণ করবার জন্য যে আন্দাজ কাঠখড় পোড়ান তা চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কয়েকজন তো এমন ধরনের ছবি আঁকেন যা বিদেশি ক্রেতাদের চোখে ভালো লাগবে, বাকি উনিশশো অষ্টআশি জন আর্টিস্ট নানারকম চাকরি –শিক্ষকতা, কমার্শিয়াল আর্ট,

শাড়ি কাপড়ের ডিজাইন এবং লোকশিল্পের কেন্দ্রে চাকরি করে জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কাটাতে বাধ্য হন। কত শিল্পীর মনেই তো এই সাধ জাগে যে, জীবনে কয়েকটা বছর এমন আসুক যখন তাঁর শিল্পকর্মই হবে তাঁর অস্তিত্বের একমাত্র কারণ, এই ইপ্সিত অভিলাষ মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো দিনরাত জ্বলবে। কিন্তু সে সুযোগ আর কজনের জন্য ঘটে।

সাহিত্যিকদেরও এই একই অবস্থা। নামকরা প্রায় সব সাহিত্যিকই খবরের কাগজে, পুরো সময়ের কিংবা পার্টটাইম চাকরি করেন। বাকি দু-চারজন শিক্ষকতা করেন। তা ছাড়াও নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করতে হয় আমাদের মোটমুটি জীবনধারণের খাতিরে।

আমাকে অনেকেই কিছুদিন থেকে একটি প্রশ্ন করছেন, "কবে আবার একজিবিশন করছেন, অনেক দিন যে হয়ে গেল।" উত্তরে বলি, একজিবিশন করার তেমন কোনো তাগিদ অনুভব করি না। আর করেই বা কী হবে? সাড়ে চার হাজার টাকা খরচ করে, দুটি বছর ধরে অমানুষিক খাটুনি খেটে এবং আমার পনেরোটি ছাত্রছাত্রীর অসীম পরিশ্রমে যে বিরাট একজিবিশন করেছিলাম ১৯৭৩ সালে তার খরচাও যে ওঠাতে পারলাম না। কাজেই একজিবিশন হল কি হল না তাতে কিছু এসে যায় না। গোনাগুনতি যে কয়েকজন আমার ছবি দেখতে চান, তাঁদের জন্য আমার দরজা তো সবসময়ই খোলা আছে। একজিবিশন করার প্রয়োজনটা কোথায়। অভিমান করে এ কথা বলছি না। আমাদের সমাজের বাস্তবটিকে ভালো করে চিনতে পেরেছি বলেই আমার একজিবিশন করার মোহ কেটে গেছে। এখানে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ছবি আঁকার সঙ্গে একজিবিশনের, শুধু দোকান খোলা ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ নেই।

প্রয়োজনবোধ করেই এতগুলো কথা বললাম। ঋত্বিক ঘটক এবং তাঁর সৃষ্টিকে বুঝতে গেলে আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্রটিকে ভালো করে জানতে এবং চিনতে হবে। ঋত্বিকবাবুর ফ্রাস্ট্রেশন, তাঁর তিক্ততা, তাঁর অভিমানের কারণ এই বাস্তব। কেউ কেউ হয়তো বলবেন তাঁর চরিত্রের বিশৃঙ্খলতাই এর মূল। এই কথাটাই যদি উলটো করে তুলে ধরি যে, এই বাস্তবই তাঁর চরিত্রে বিশৃঙ্খলা এনেছিল, সেটাই বা অযৌক্তিক হয় কেমন করে? আমি মানছি যে, এই বাস্তবের জাতাকলের চাপে পড়ে অনেকেই চুপসে যান—আবার কেউ কেউ এই চ্যালেঞ্জের সামনে রুখে দাঁড়ান। কথাটি আংশিকভাবে সত্য। যাঁরা রুখে দাঁড়ান দেখা যাবে তাঁরা অন্যত্র কম্প্রোমাইজ করছেন। ঋত্বিকবাবু আর যাই করে থাকুন, নিজের কাজের ক্ষেত্রে উনি বিন্দুমাত্র কম্প্রোমাইজ করেননি। অনেকের নজরে তাঁর চরিত্রের অন্য দোষ দেখা দিলেও এই ক্ষেত্রে তাঁকে মর্যাদা না-দিয়ে তাঁরা পারবেন না। অন্য সব দোষগুণ তো এই মহান গুণের সামনে তুচ্ছ, নগণ্য। এর জন্য তাঁকে যে সাংঘাতিক মূল্য দিতে হয়েছে সে কথা আমরা সবাই-ই জানি। তবে তাঁর বিশৃঙ্খল জীবনের কিঞ্চিৎ প্রভাব তাঁর ছবিতে পড়েছিল কি? এই জন্যই কি তাঁর ছবিতে একটা অসমানতা দেখা যায়? এ কথাটি তাঁর প্রায় প্রত্যেক ছবি দেখবার সময় আমার মনে এসেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যে, একটি মাস্টারপিস্ দেখছি—যেমন বসাবার কায়দা, ইমেজারি গল্প বলবার ভঙ্গি এবং জোরালো বক্তব্য ইত্যাদি। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে বানাল এবং কনফিউজড্। ছবির মান মাঝে খাটো হয়েছে আবেগবাহুল্য এবং

থিয়েটারি ভাবের ওপর জোর দেওয়ায়। ফলে মেলোড্রামা প্রাধান্য পেয়েছে অনেক জায়গায় এবং বিষয়ের সঙ্গে স্টাইলের বিরোধ ঘটেছে। কমিটেড ফিল্ম-এ যাঁদের আজ সর্বোচ্চ মান--যেমন গদার, কস্টা গাভরাস, গ্লবার রোসা ইত্যাদি—এঁদের কাজের কথা মনে করেই এই খেদ প্রকাশ করছি। কমিটেড ফিল্ম কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার বিশ্লেষণ এবং চাক্ষুষ প্রক্ষেপণ না হলে প্রয়োজনীয় মূল্য সৃষ্টি করতে পারে না। নাটকের গঠনে কমিটেড সিনেমা এক ধরনের অদৃশ্য শক্তির আভাস দেয়, বিশেষত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। এক কথায় বলতে গেলে জনগণের বোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে সোচ্চার হয়ে, দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে গদারের 'লা শিনোয়াজ' ১৯৬৭ সালে তৈরি হয়েছিল এবং এতে ফ্রান্স-এর মে বিপ্লব সম্বন্ধে আভাস দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দেশে জনগণের ক্ষমতাকে বোঝা বা সঠিক পথে চালনা করার চেষ্টা কোনো আর্টিস্ট, চলচ্চিত্রকার, লেখক বা রাজনৈতিক দল--কেউ-ই করেননি। এবং ঋত্বিকবাবু একমাত্র কমিটেড চলচ্চিত্রকার হিসাবে সম্পূর্ণ একা নিঃসঙ্গতায় কাজ করে গেছেন, কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের দেশে সেই অর্থে কোনো কমিটেড চলচ্চিত্রকার নেই, এবং কমিটেড চলচ্চিত্রের জন্য ইউরোপ বা সাউথ আমেরিকার মতো কোনোরকম আন্দোলনও নেই। ওই সমস্ত দেশে নানারকম ছবি হচ্ছে—'ব্যাট্‌ল অফ আলজিয়ার্স', 'কেমাদা', 'জেড', 'দি কনফেশন', 'বিফোর দি রেভোলিউশন', 'ওয়ার ইজ ওভার', 'আন্তনিও দি মর্টেস', 'র‍্যামপার্টস অফ ক্লে' ইত্যাদি। ওই সমস্ত দেশের যুবক-যুবতিরা পুরোনো বুর্জোয়া ভঙ্গিতে তৈরি ত্রিকোণ প্রেমের ছবির চেয়ে ওই সমস্ত কমিটেড ছবি দেখতেই বেশি পছন্দ করেন।

উলটোদিকে, আমাদের দেশে কী দেখছি—জনসাধারণের 'দুর্বল অংশ'-এর প্রতি আমাদের দেশের 'এলিট'দের কর্তব্যবোধ দেখা যায়, তাদের সমস্যা দেখানো হচ্ছে পর্দায়, লেখায় বা আলোচনায়। এই ধরনের ব্যাপারগুলো হয়তো খুব কৃষ্টিমূলক হতে পারে কিন্তু কোনো প্রয়োজন সাধন করে না।

এই কলকাতা শহরেই ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আজ প্রায় প্রতি পাড়ায় একটি করে ফিল্ম ক্লাব ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। এইসব সংস্থার সদস্য হবার জন্য রীতিমতো ঠেলাঠেলি চলেছে। নতুন সদস্য হওয়া নাকি একেবারে অসম্ভব! তবুও সত্যিকারের কোনো ভালো বিদেশি ছবি ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখানো হলে এক সপ্তাহও চলে না। কিছুদিন আগে ফেলিনির দারুণ ছবি--'অ্যামরকর্ড' এক সপ্তাহেই উঠে গেল। এইতো সেদিন 'আলিয়াঁস্ ফ্রাঁসেজ'-এ ব্রেসঁর তৈরি আশ্চর্য ছবি 'উন ফান দুস' দেখতে গিয়ে দেখি হলঘর প্রায় খালি। ফেলিনি, গদার, আন্তনিওনি এঁদের ছবি যে সব-সময় খুব সহজবোধ্য হয় তা বলা যায় না, বিশেষ করে আঙ্গিকের দিক থেকে। কিন্তু ঋত্বিকবাবু মোটামুটি সর্বহারাদের নিয়েই ছবি করেছেন। ফর্মের দিক দিয়েও এমন কিছু মারপ্যাঁচ ছিল না যে সাধারণ দর্শকদের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে, তবে কেন তাঁর দর্শকের অভাব ছিল? এখানেই হার্বার্ট বিডের— "Collective mind seeks lowest level of gravity" এ কথাটির তাৎপর্য।

আমরা যে-দেশে বাস করি সেটি একটি 'sea of mediocrity', এই মহাসমুদ্রে দু-একজন ছাড়া আর সবাই আমরা ভাসছি। এর আওতায় থেকে শিল্পী 'higher level of individual sensibility and perception'-এর সন্ধানে বেরিয়ে আসবেন, এটা কাম্য হলেও অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর তার চাইতেও হাজার গুণে কঠিন আজকের বাস্তব। এই বাস্তবের আস্তরণকে ভেঙে ফেলা নিতান্তই প্রয়োজন। কিন্তু আজ চারিদিক নিস্তব্ধ, নিস্তেজ, অসাড়।

তাই ঋত্বিকবাবুর মতো সাহসী লোকের অভাব খুবই বোধ করছি।

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋত্বিক : দোষে অনন্য, গুণে অনন্য

'যুক্তি তক্কো গপ্পো' দেখে এক বন্ধুর মন্তব্য : "অত সুন্দর হাত আর আঙুল—ঋত্বিকের মতো, খুব বিরল। হাত যেন কথা বলে, লম্বা সুগঠন আঙুলগুলো সে বারবার ব্যবহারও করেছে, কথা বলার সঙ্গে।"

কোথায় যেন পড়েছিলাম বা শুনেছিলাম, সুগঠন সুন্দর আঙুল সহজ সরল মনের আর চিন্তার পরিচয়, যে-মনে জটিলতা নেই, সংঘাত নেই।

কিন্তু সংঘাতের ঢেউ যদি ঋত্বিককে তোলপাড় না করত, তবে তার শিল্পীমনের ধারা কোন্‌দিকে বইত কে জানে। তার ব্যক্তিত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যেক শিল্পীই তার নিজস্ব শিল্পক্ষেত্রে স্বতন্ত্র, কাজেই সেটা নতুন কথা নয়। তবু ঋত্বিক অনন্য। দোষে অনন্য, গুণে অনন্য। আমরা সবাই নিজেকে ভালোবাসি। ঋত্বিকও বাসত। ওর বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। ওর আত্মপ্রত্যয় অসাধারণ, ওর আত্মম্ভরিতা অসামান্য, ওর লম্বা আঙুলগুলো দিয়ে ও চেয়েছিল সারা আকাশময় ছবি আঁকতে। সে ছবি নিছক স্বপ্নালুতা নয়। সে ছবি অন্যায়ের প্রতিবাদের, ন্যায়ের দাবির। কিন্তু ওর আঙুল আর আকাশের মাঝখানে আশমানজমিন ফারাক। তখন সে স্ববিরোধিতায় ক্ষতবিক্ষত। যে-লোক একদিন মদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে রুখে দাঁড়িয়েছিল, সে কেন মদ্যপানের ক্রীতদাস হল? ওকে কখনও জিজ্ঞেস করিনি। কারণ ও হয়তো একটা অসম্ভব রূঢ় উত্তর দিতে পারত।

লেখা, রাজনীতি, রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র সবকিছুতেই তার স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ। যেন তাকে কোনো কিছুই অনুশীলন করতে হয়নি, কষ্ট করে আয়ত্ত করতে হয়নি। 'অযান্ত্রিক'-এর মতো এক অভিনব বিষয়বস্তুকে ও এমন সময়ে তুলে ধরল লোকের কাছে, যার জন্যে সাধারণ দর্শকের মন তৈরি নয় তখনও। ঋত্বিকের প্রত্যাশা সেখানে প্রচণ্ড মার খেল। ও চেয়েছিল সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছোতে। পারল না। একবারই শুধু ও পিছু হঠল, 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' ছবিতে। কিন্তু ওর উদ্দেশ্য ছিল দর্শকদের কাছে টানা। তাদের কাছে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা।

তার 'সারি সারি পাঁচিল' লেখার মধ্যে ফুটেছে ছবি-করিয়ের যন্ত্রণার দিক। সবচেয়ে তীব্র ভাষায় সে কথা বলছে দর্শকের সঙ্গে।

"আপনারা যা ভালবাসেন তাই পান। আপনারা নতুন ধরনের ছবি ভালবাসেন না।...দর্শকদের মধ্যে যাঁরা আজ চেতনাসম্পন্ন তাঁরা যদি 'ফিল্ম-ক্লাব' করার মাধ্যমেই হোক, আর অন্য যে কোনো উপায়েই হোক, সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারেন, তাহলে বট্‌তলাই আপনাদের ভাল, রবিঠাকুর নেই বলে চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই। আমি আমার সমস্ত অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি ক্ষতি আপনাদের, যারা ছবি করছে তাদের নয়। তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং পরিবারগত জীবনকে বিপন্ন করছে, তার দ্বারা তারা একটি তীব্র আনন্দ পাচ্ছে, উগ্র তপস্যার আনন্দ। আপনারা সামান্যই পেলেন এবং অচিরে একদম পাবেন না।

অথচ আপনাদের হাতেই সব। আপনারাই সব। আপনাদের রায়ই সব। আপনারা আক্রমণ করুন, আঘাত করুন, কিন্তু বাঁচাতে দিন, যদি অবশ্য বাঁচানোর কোন কারণ আপনারা দেখতে পান। না পেলে তাও চীৎকার করে বলুন। কাগজে চিঠি দিন। পাড়ার মোড়ে জটলা করুন। বাংলার মরে যাওয়া সংস্কৃতি আজ এই নতুন মাধ্যমকে প্রাণপণে মরণাপন্নের মত আঁকড়ে ধরেছে, আপনারা প্রমাণ করুন যে এ আপনারা চান না। মিটে যাক। চুকে যাক। নিশ্চিন্তমনে আমরা পয়সা পেটা ছবি করি। আর আদুড়গায়ে বসে থেলো হুঁকোয় তামাক টানি। আজ দিন এসেছে দল বেছে নেবার।

আপনারাও একটি বড় পাঁচিল। বোধহয় সবচেয়ে বড় পাঁচিল।"

(চলচ্চিত্র, ১৯৫৯)

'অযান্ত্রিক'-এ সে যন্ত্রের মধ্যে দেখেছিল সুখদুঃখের অনুভূতি, 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' ও 'সুবর্ণরেখা'য় সে দেখিয়েছে যান্ত্রিক রাজনীতির বলি মানুষকে। দেশভাগের বেদনায় সে নিজেও ছিল পীড়িত। হয়তো সেই ব্যথা সে ভুলতে পেরেছিল যখন নিজের হারানো দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সে 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে রূপ দিয়েছিল চলচ্চিত্রে। 'তিতাস'-এর মধ্যে তাই সে আবার ধরতে পেরেছিল গীতিকাব্যের মূর্ছনা। ছবিটার সম্পাদনার বহু দোষ সত্ত্বেও। কারণ তখন ঋত্বিক রীতিমতো অসুস্থ, বলা চলে যমে-মানুষে টানাটানি।

উগ্রতা ও স্পষ্টভাষণ সত্ত্বেও কম লোকের ভালোবাসা পায়নি ঋত্বিক। ভালো সেও বেসেছে, তার নিজের ধরনে। তার মধ্যে জেদ ছিল, রাগ ছিল, অসহিষ্ণুতা ছিল, কিন্তু ছলনা ছিল না। আইপিটি-এর সহকর্মী হিসেবে যত ঝগড়াঝাঁটিই হোক, একটা আত্মীয়তাবোধ সর্বদাই আমাদের নিকট রেখেছে। যেমন নিকট আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে সহজে লোকে তলিয়ে ভাবে না, তেমনি ঋত্বিক সম্পর্কে আগে এত ভাবিনি, আজ যেমন ভাবছি। এতকাল ধরে নিজের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে ছেলেখেলা করেছে যে, সে যে নেই, কোথাও নেই, এ কথা মানতে পারি না, চাই না। ভাবতে গিয়ে তাকে নতুন করে কাছে পাচ্ছি. নতুন বেদনায় কাঁদছি। সবাই আমরা ওকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, ফেরানো অসম্ভব জেনেই। সকলের মনের মধ্যে তাই ও সমান ঔদ্ধত্যে বিরাজ করছে।

শেষ দেখেছি সপ্রু হাউসের বারান্দায় ঝোলা কাঁধে। বলল, "যান দেখে আসুন কীরকম অভিনয় করেছি।" বললাম, "সেইজন্যেই তো এলাম।" কিন্তু 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' অভিনয়ও করেনি। উলটেছে নিজের জীবনের পাতাগুলো। তার কোনোটা ছেঁড়া। কোনোটা আনকোরা।

প্রমোদ লাহিড়ি

ঋত্বিক

আমরা মধ্যপ্রদেশের লোক। মধ্যপ্রদেশের চিরিমিরিতে কয়েক পুরুষ ধরে আছি। এটা নেটিভ স্টেট, নাম কোরসিয়া। এই স্টেটের Chief Engineer ছিলেন ক্ষিতিশ রায়, তিনি ঋত্বিকের ভগ্নীপতি—ওখানে ঋত্বিক প্রায়ই আসত। সুরেশ ঘটক, মানে ঋত্বিক ঘটকের বাবা ছিলেন আবার আমার বাবার বন্ধু। তখন ওখানে রাজাদের গাড়ি ছিল, আর ছিল আমাদের। স্টেশনের পথটা ছিল বিশ্রী পাহাড়ি এলাকার মধ্য দিয়ে। তাই ঋত্বিকের যাতায়াতের জন্য ওই গাড়ি প্রায়ই ব্যবহার হত। সে তখন খুব ছেলেমানুষ আর কী। ১৯৪৪ সালে আমার বিয়ে হল, সেই সময়ে ও আবার আমাদের ওখানে আসে। Actually ওর বন্ধুত্বটা হচ্ছে আমার স্ত্রীর সঙ্গে—ওরা সমবয়সি। আমার স্ত্রী ও আমার বউদি দুই বোন—ওদের কোনো ভাই নেই। তাই তখন থেকেই আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা মামা বলতে চিনত ঋত্বিককে।

ঋত্বিক পড়াশোনা করত প্রচুর, আর interest ছিল নানা বিষয়ে। গানেরও শখ ছিল, ভালো বাঁশিও বাজাত—আমারও গানের শখ ছিল। ক্লাসিকাল গান নিয়ে ওর সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতাম আর আমরা আলোচনা করতাম আইজেনস্টাইন, পুডোভ্কিনের ছবি-টবি নিয়ে। আমার film-এ interest অনেকদিন থেকে, সেই ১৯৪০ থেকে। আমি film industry-তে আসি as an exhibitor—আমাদের তিনটে সিনেমা হল আছে। আমার কাজই ছিল কলকাতা থেকে ভালো ভালো film নিয়ে এসে দেখা; বিশেষত ঋত্বিক এলে তো আমার কাজই ছিল bunch of films নিয়ে এসে দেখা আর ওই film নিয়ে আলোচনা করা। তখন সবেমাত্র সুবোধবাবুর 'ফসিল' গল্পটা বেরিয়েছে। ওই গল্পটাকে ছবি করা নিয়ে কত আলোচনা, কত script লেখালেখি হয়েছে। আমার স্ত্রী ফিল্ম করার ভীষণ বিরুদ্ধে ছিল, আর 'তোরা ফিল্ম করছিস' বলে ঋত্বিককে প্রায়ই গালাগালি করত।

ঋত্বিক তখন কলকাতায় ফিরে গিয়ে ফিল্মের লোকদের সঙ্গে, ওই আর কী, কাজ-টাজ করত। আমাকে একদিন লিখল, "প্রমোদদা আমি 'নাগরিক' করছি।" আমি তখন কলকাতায় খুব অল্পই এসেছি, নিজের ব্যাবসার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে আসতে হত। সম্ভবত ১৯৫২ সালে ও 'নাগরিক' করল। এর মধ্যে আমি একবার কলকাতায় এসেছি, shooting দেখেছি, আর ৫২-তে যখন complete করল তখন কলকাতায় এসে Light House

miniature-এ দেখলাম। সত্যই অসাধারণ ছবি করেছিল। নানা অসুবিধার মধ্যে, এর কাছ থেকে, ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে—যার জন্য ছবিটা released-ই হল না।

১৯৫৪ সাল—আমি তখন ব্যাবসার ব্যাপারে নাগপুরে আছি। ওখানে আমাদের একটা অফিস ছিল। ও তখন বিয়ে করবে বলে স্থির করেছে। আমার স্ত্রীকে চিঠি লিখল, 'তোর মতামত জানাস।' স্ত্রী লিখল, 'তোর কোনো রুজিরোজগারের ঠিক নেই, তুই চলেছিস বিয়ে করতে?' যাইহোক ঋত্বিক জানাল, ও বম্বে যাচ্ছে, স্টেশনে যেন দেখা করি। দেখা হতে দিলাম তো খুব গালাগালি; বললাম, 'ভালো-টালো কিছু কর, সিনেমা-টিনেমা করলে বিয়ে করা যায় না।' শেষ পর্যন্ত ওর বিয়ে হয়ে গেল; লক্ষ্মীকে গিয়ে দেখেও এলাম।

১৯৫৬-য় আমি এলাম কলকাতায়—এলাম ছবি করবার জন্য। প্রথমে আমার plan ছিল 'লৌহকপাট' করব। আরম্ভ করলাম 'পরশপাথর'। এর একটা ইতিহাস আছে। আমার প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিল প্রদীপ মৈত্র। একদিন ও এসে বলল, 'দাদা, মানিকদার ছবি আটকে রয়েছে, আর পুরো ইউনিট বসে রয়েছে।' ব্যাপারটা হচ্ছে 'জলসাঘর' করতে করতে ছবিবাবু চলে গেলেন বার্লিনে 'কাবুলিওয়ালা'র প্রাইজ নিতে; আর অরোরা করল কি, যদ্দিন না ছবিবাবু ফিরলেন তদ্দিন প্রোডাকশন বন্ধ রাখল—দু-মাসের জন্য প্রোডাকশন বন্ধ রইল। তখন মানিকদার অবস্থা খুব খারাপ। তার আগে 'অপরাজিত' commercially flop করেছে। আমার কীরকম একটা লাগল। তার আগে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' ছবি দেখেছি। অত বড়ো একজন ডাইরেক্টর... কী করা যায়? একটা ছবি already ধরে ফেলেছি, ফিল্ম লাইনে নতুন এসেছি।

দাদা তখন বিজনেসের ব্যাপারে প্রায়ই রাঁচিতে আসতেন। মানিকবাবুকে দিয়ে আমি ছবি করাব ভেবে দাদাকে সব বললাম। দাদা একটা কথা বলেছিলেন সোজা ভাষায়, 'What will be the damage?' আমি বললাম, 'লাখখানেক হবে।' 'কী ছবি করছ?' আমি বললাম, 'একটা এক্সপেরিমেন্টাল ছবি।' 'Are you very keen? 'Very keen. I want to help him'। দাদা বললেন, 'OK' এদিকে ঋত্বিককে আমি কথা দিয়েছি যে ছবি করাব।

তখন হচ্ছে কী, ঋত্বিক প্রায়ই আসে যায়, script নিয়ে আলোচনা হয়; ওর ইচ্ছে যে একটা ছবি করাই। ওটা আমার মাথায় রয়েছে; একটা ছবি করব, ওকে দিয়েই করাব। ইচ্ছেটা বেশি হচ্ছে আমার স্ত্রীর। সবাই যখন করছে—তপন সিনহা করছে, সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে করানোর ইচ্ছে, তখন ভবা কেন করবে না? Ultimately তো করবে, কিন্তু একসঙ্গে এতগুলো ছবি! তখন ঋত্বিকের একটা attitude আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমি সোজা ওকে গিয়ে বললাম, 'মানিকবাবু ওঁর ইউনিট নিয়ে বসে রয়েছেন, অতো বড়ো একজন director, আমার মনে হয় তোর এখন ছবি না-করলে ভালো হয়।' ও সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'প্রমোদদা, ওঁকে দিয়ে ছবি করাও। I will wait.' আমি বললাম, 'ভালো মনে বল কিন্তু, আমি তাহলে আর এগোব না।' ওর কথা, 'ওঁকে দিয়েই করাও।' That was a great thing।

এদিকে হচ্ছে কী, মানিকবাবুর সঙ্গে পরিচয় নেই; ওই ফিল্ম সোসাইটির শোতে মাঝে মাঝে দেখা হয়। তখন তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলে 'পরশপাথর' launch করে

দিলাম। এরপর naturally বাড়িতে গঞ্জনা। সবাই ছবি করছে, ভবা কেন করবে না। আমি বললাম—ঠিক আছে, 'অযান্ত্রিক'ও চালু কর। এই হল first episode of 'অযান্ত্রিক'।

'অযান্ত্রিক'-এর পিছনে ঋত্বিক প্রচণ্ড খেটেছিল। একের পর এক script লিখেছে, ছিঁড়ে ফেলেছে। script-ই লেখা হয়েছে কমসে কম ৬-৭ বার। এটা একটা sheer experimental ছবি। এটা হওয়া দরকার—না হলে হবে না। ওই যে ৭—৯—১২-র থিয়োরি। ওটাকে না-ভাঙলে চলবে না। আমরা তখন ইয়ারকি করে একটা কথা বলতাম, ৭—৯—১২ থিয়োরি। বাংলা ফিল্‌মে এখনও এ থিয়োরি চলছে দেখছি। ১২টা রিলের ৭ নম্বর পর্যন্ত introduction, character ইত্যাদি, এবং ৭ নম্বরে একটা climax, ৯ নম্বরে একটা climax, আর ১২ নম্বর রিলে আরও একটা climax। ওর নাম হচ্ছে ৭—৯—১২-র থিয়োরি। ওর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে—একটা কিছু করতে হবে। এর আগে ফ্লাহার্টির ছবি আমরা একসঙ্গে দেখেছি, তারপর neo-realism-এর ছবি; তার আগে হয়ে গেছে First International Film Festival। সব ছবি দেখেছি—তখন আমরা supercharged। এর পরে আরম্ভ হল 'অযান্ত্রিক'।

As a director ঋত্বিক যাতে সবরকম facility পায় সেদিকে আমি সবসময় নজর রাখতাম—আমি কোনো ত্রুটি রাখিনি। ফিল্‌ম আমরা expose করেছি দু-লাখ ফিটের ওপর—সাধারণ ratio হচ্ছে 1 : 5. আমরা রাঁচিতে শুটিং করতে গেছি; বর্ষার একটা সিকোয়েন্স—বৃষ্টি। যেখানে ক্যামেরা লাগাই সেখানে বৃষ্টি হয় না, অন্যদিকে বৃষ্টি হয়। তখন আমরা তিন সেট ক্যামেরা বসিয়েছি, যেখানে বৃষ্টি হচ্ছে সেখান থেকে শট নিতে হবে। একটা fading light, থাকে হয়তো, দু-তিন মিনিট, তিন-চারটে angle থেকে ক্যামেরা না-ধরলে হয় না। ওরাওঁদের dance, ওটা তো একদিনে তুলতে হবে। তিন সেট ক্যামেরায় কাজ হল—খোকার একটা ক্যামেরা, খোকার অ্যাসিস্ট্যান্টের একটা ক্যামেরা, আর রাঙাদা মানে সুধীশ ঘটকের একটা ক্যামেরা। সুতরাং আমরা কোনো compromise করিনি। কালী ব্যানার্জি তখন professional stage-এ বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার অভিনয় করে। ওই দিনগুলির আগের দিন শুটিংয়ের পর গাড়ি ছুটত কালীকে নিয়ে রাঁচি স্টেশনে ওঁর যাতে অভিনয়ে অসুবিধা না হয়। পরের দিন আবার গাড়ি ছুটত ওঁকে নিয়ে আসার জন্য। Indoor-এ outdoor-এর সেট ফেলার experiment-টা আমরা প্রথম করলাম। রাঁচি স্টেশনের সেটটা পুরো কলকাতার টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে ফেলা হয়েছিল।

এর পরে আমার personal ইচ্ছে ছিল সমরেশের 'অকাল বসন্ত' গল্পটাকে ছবি করা। পুরো script complete। সমরেশ বলেছিল গল্পটা একটু এদিক ওদিক করে দেবে। কিন্তু একটা মস্ত গণ্ডগোল হয়ে গেল। যখন আনতে গেলাম, দেখি একশো টাকার বিনিময়ে সমরেশ গল্পটা সুমনা ভট্টাচার্যকে দিয়ে দিয়েছে। 'অকাল বসন্ত'-এর কী অপূর্ব script যে হয়েছিল!

কী করা যায়? Experimental ছবি করবার ইচ্ছে আমাদের, তখন শিবশংকর মিত্রের 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' বইটা বেরিয়েছে। আমি একজন শিকারি; ইচ্ছে শিকারের ওপর

একটা ছবি করা। লেখকের সঙ্গে contract হয়ে গেল। তখন একটা আইডিয়াল ছিল—এমন কোনো কাজ করব না যাতে film-industry-র লোকেদের ক্ষতি হয়। ইন্ডাস্ট্রির নিয়মানুসারে কন্ট্রাক্টের টাকাটা খেপে খেপে দেব বলায় লেখকের সঙ্গে মতে মিলল না।

তখন আর কী, শিবরাম চক্রবর্তীর 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'-টা নিয়ে script করতে দিই। সেটা আর ultimately children film হল না; হ্যাপি প্রিন্সট্রিন্স ঢুকে গিয়ে একটা serious film হয়ে গেল। ঋত্বিকের মাথায় তো তখন নানান ধরনের idea।

তারপরে যেটা, সেটা হচ্ছে 'মেঘে ঢাকা তারা'। আমরা তো তখন ফ্লপটপ করে বসে আছি। জনতা পিকচার্সের মহেন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল। মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'start something যাতে commercial হয়। তুমি উত্তমকে নাও, সুপ্রিয়াকে নাও, একে নাও, ওকে নাও।' আমি বললাম, commercial বলে commercial কিছু করা সে তো হয় না, যদি হয়ে যায় তো হয়ে গেল।' আমাদের মাথায় তখন 'মেঘে ঢাকা তারা'-র আইডিয়াটা এসে গেছে। আমি বললাম, 'সুপ্রিয়াকে আমরা নিতে পারি।' তখন মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'ঠিক আছে; start করো।' তখন কী জানি কেন আমি বললাম ঋত্বিকের নামে প্রোডাকশন হোক, আমি গ্যারান্টার থাকব। 'চিত্রকল্প' নাম দিয়ে ঋত্বিকের নামে প্রোডাকশনটা হল, I was the guaranter। অতগুলো টাকা নষ্ট করেছিলাম। তখনকার দিনে তিন-সাড়ে তিন লাখ টাকা—মনের মধ্যে কেমন একটা guilty ভাব ছিল; আমি না-করে ওর নামে করলাম।

'অযান্ত্রিক' commercially successful একেবারে হয়নি। তখনকার দিনে আমার খরচ পড়েছিল দেড় লাখ টাকা! Print আর publicity নিয়ে another fifty thousand। ১৭টা print করা হয়েছিল। মোট দু-লাখ টাকা। Print ও publicity-র টাকাটাও পুরো ওঠেনি। আমি কোনো distributor-এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে করিনি—distributor ছিল অরোরা। Print ও publicity-র টাকাটাও না ওঠায় তখন খুব ঘা খেয়েছিলাম। তারপর এল 'পরশপাথর'। Negative cost পড়েছিল এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। আর 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'র cost এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার।

আমরা তখন 'কান'-এ গেছি 'পরশপাথর' নিয়ে। ওখানে ভেনিস ফিল্‌ম ফেস্টিভ্যালের director-এর সঙ্গে কথা হল। 'অযান্ত্রিক' ভালো press publicity পেয়েছিল, সেগুলি সঙ্গে ছিল! তা ছাড়া subject-matter-টা তাঁকে charm করেছিল। সাদুলকে ছবিটা দেখানো হল। তিনি বললেন, 'গাড়িটাকে আমি চিনেছি, বিমলকে আমি চিনেছি।' কিন্তু অত অল্প সময়ের মধ্যে সাবটাইটেল করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং 'অযান্ত্রিক' Information Centre-এ দেখানো হল। এরপরে গেল এশিয়ান ফিল্‌ম ফেস্টিভ্যালে। ১৯৬৩-তে 'অযান্ত্রিক', ১৯৬৫-তে গেল 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'। সর্বত্র খুব ভালো reaction। পুনার ফিল্‌ম ইন্সটিটিউটে 'পরশপাথর' ও 'অযান্ত্রিক' ছবি দুটো course-এতে স্থান পেয়েছে।

ঋত্বিকের বদলে যাওয়ার ব্যাপারটা শুরু হয় 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' করার সময় থেকে। অনেকে তখন আমায় বলতেন, 'আপনি একজন Dr. Frankenstine. ঋত্বিক আপনার

monster; আপনি একজন monster তৈরি করেছেন।' না, monster তৈরি আমি করিনি। Monster in the other sense—ঋত্বিক একজন creator, যা করেছি ঠিকই করেছি। যদি personal ব্যাপারে আসেন, তাহলে ওর মদ খাওয়ার ব্যাপারে বলব, সে ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ অপছন্দ করত। ও আমার স্ত্রীকে বলেছিল, 'আমি সব কিছু করব, মদ কখনও খাব না। আমার ভাইদের দেখে আমার শিক্ষা হয়েছে।' সেই ছেলে শেষ পর্যন্ত alcoholic হয়ে গেল। কিন্তু শিল্পীস্বরূপ যে একটা জ্বালা—যেটা করতে চাই সেটা করতে পারছি না, সেই জ্বালা তার ভেতরে বরাবরই ছিল; সে কখনোই satisfied হতে জানত না। অনেকে বলেন, ঋত্বিক frustrated হয়ে গেছল; কিন্তু তার তো frustrated হবার কথা নয়, সে তো লোকের কাছ থেকে পেয়েছে প্রচুর। তবু সব কেমন হয়ে গেল!

সত্যজিৎ রায়

ঋত্বিক

ঋত্বিকের সঙ্গে সামনাসামনি পরিচয় হবার আগে আমি তাঁকে প্রথম চিনি নিমাই ঘোষের ছবি 'ছিন্নমূল'-এর অভিনেতা হিসাবে। তার আগে আমি ঋত্বিককে চোখে দেখিনি কখনও। নিমাইবাবু ছিলেন আমাদের ক্যালকাটা ফিল্‌ম সোসাইটির একেবারে প্রথমদিকের সভ্যদের মধ্যে একজন। তিনি যখন 'ছিন্নমূল' ছবি করছেন, মাঝে মাঝে আমার কাছে আসতেন এবং ছবি সম্বন্ধে নানারকম গল্প করতেন। সেই ফাঁকে ঋত্বিকের কথাও মাঝে মাঝে উঠেছে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি ওঁকে একটা অভিনয়ের সুযোগ দিয়েছি। ছেলেটির মধ্যে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে প্রচুর উৎসাহ রয়েছে।'

তার পরে বেশ কিছুকাল আমি ঋত্বিকের সঙ্গে সামনাসামনি পরিচিত হইনি। ফিল্‌ম সোসাইটিরই একটা মিটিং-এ সে আসে এবং তখনই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ফিল্‌ম সোসাইটির বৈঠকে সে যে ঘনঘন আসত তা নয়। কাজেই তখনও তাঁকে ভালো করে চেনবার সুযোগ হয়নি। আমার ধারণা সে সময়টা ঋত্বিক বোধহয় নাটক এবং মঞ্চ সম্পর্কেই আরও বেশি উৎসাহিত ছিল।

আরও কিছুকাল পরে, বেশ কিছুদিন পরে অরোরা কোম্পানির আপিসে ঋত্বিকের সঙ্গে আমার সত্যি করে পরিচয় হল। সে বোধহয়, যতদূর মনে পড়ে, সেসময়ে বোম্বেতে বিমল রায়ের সঙ্গে কাজ করছে, বিমল রায়ের ছবির চিত্রনাট্য লিখছে। তার কিছু আগে 'পথের পাঁচালী' ছবিটি মুক্তি পেয়েছে, ঋত্বিক সে ছবি দেখেছে এবং দেখে তার খুবই বেশি রকম ভালো লেগেছিল। সে কথা সে প্রাণ খুলে আমার কাছে বলে। কিন্তু আমার কাছে যে-জিনিসটি সব চাইতে ভালো লেগেছিল সেটা সে যেভাবে ছবিটাকে বিশ্লেষণ করেছিল—তার কয়েকটা দৃশ্য—যেটা থেকে আমার মনে হয়েছিল, ঋত্বিক যদি ছবি করে তাহলে সে খুব ভালোই ছবি করবে। তারও পরে যখন 'অপরাজিত' ছবির সম্পাদনার কাজ হচ্ছে বেঙ্গল ফিল্‌ম ল্যাবরেটরিতে তখন শুনলাম একটি ছবির প্রিন্ট সেখানে রয়েছে। সে ছবি হল ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি 'নাগরিক'। তৎক্ষণাৎ আমরা সেই ছবি দেখি। খুবই অসুবিধার মধ্যে তোলা হয়েছিল ছবিটা, সেটা দেখলেই বোঝা যায়। তার বাইরের পালিশ একদমই নেই বলতে গেলে, কিন্তু তাও তার মধ্যে কতকগুলো এমন

গুণের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম যে তাতে এই নবীন পরিচালক সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড শ্রদ্ধা জাগে আমার মনে।

তার কিছুকাল পরে 'অযান্ত্রিক'-এর আবির্ভাব। 'নাগরিক' ছবি বাজারে দেখানো হয়নি। 'অযান্ত্রিক' ছবির প্রথম শোতে আমি উপস্থিত ছিলাম। এবং সে ছবি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম একজন সত্যিকারের শিল্পী যদি সত্যিকারের কাজের সুযোগ পায়, তাহলে সে একধাপে কতদূর এগিয়ে যেতে পারে। 'অযান্ত্রিক' ছবি ব্যাবসায়িকভাবে ভালো চলেনি। তার কারণটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট ছিল। ঋত্বিক বিষয়বস্তু নির্বাচনে একটা অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। ঠিক সেই জাতীয় ছবি তাঁর আগে বাংলার চলচ্চিত্র জগতে কেউ করেনি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে নীরস ছবি—নায়ক বলতে একজন গাড়ির ড্রাইভার এবং নায়িকা বোধহয় সেই গাড়িটাকে বলা চলে। সেখানে সাহসের পরিচয় বলতে একটা ছিল যে, সেই গাড়িটার মধ্যে একটা মনুষ্যত্ব আরোপ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, যাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের anthropomorphism, সেটা যে সব জায়গায় উতরেছিল সেটা আমি বলব না; কিন্তু বাংলার চিত্রজগতে কাজ করতে এসে, বাংলার দর্শকদের কথা মনে রেখে একজন শিল্পী যে এটা আদৌ করবার সাহস পেয়েছে সেটাই হচ্ছে আশ্চর্যের কথা। তারপরে 'অযান্ত্রিক'-এর, আমার কাছে, যে সবচেয়ে লক্ষ করবার মতো জিনিস কতকগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে, বিষয়বস্তু বাদ দিয়েও সে জিনিসটা অনেক ছবিতেই পাওয়া যেতে পারে, এক ধরনের দরদ, মানবিকতা। এগুলো অনেকের ছবিতেই লক্ষ করা যেতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত গুণগুলো থাকলে একটা ছবি সত্যিকারের সার্থকতা অর্জন করতে পারে সেই ধরনের চলচ্চিত্রের কতকগুলো বিশেষ গুণ 'অযান্ত্রিক'-এ প্রায়ই বহু জায়গায় লক্ষ করা যায়। আমি কয়েকটা উদাহরণ দেব। আজকে আপনারা এ ছবি দেখবেন। যাঁরা আগে দেখেছেন, তাঁরা দ্বিতীয়বার দেখবেন নিশ্চয়ই, এবং তারা এগুলো লক্ষ করতে পারেন। এগুলো হচ্ছে বিশেষ করে কতকগুলো শট, যেখানে ঘটনা হয়তো কিছুই ঘটছে না, উপাদান সামান্যই। কিন্তু একটা বিশেষ context-এ এসে সেই শট এমন একটা কাব্যের পর্যায়ে উঠে গেছে, এমন একটা শক্তিশালী চেহারা নিয়েছে যেটা একমাত্র অত্যন্ত শক্তিশালী পরিচালকের পক্ষেই সম্ভব। আপনারা দেখবেন গাড়িটাকে নিয়ে কত কী করা হয়েছে। গাড়িটা কিছু না, একটা লেকের ধারে গাড়িটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সন্ধেবেলায়। তার দৃষ্টিকোণ, তার composition এমন আশ্চর্য, সেটা যেন একেবারে স্পষ্ট কথা বলছে। তারপর আর একটা দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে গাড়ির শুধু বনেট। বনেটের ওপর সেই ক্যাপটা রয়েছে। ঢাকনাটা খুলে বিমল তাতে জল ঢেলে ঢাকনিটায় তিনটে প্যাঁচ দিয়ে বন্ধ করে হাত দিয়ে, রুক্ষ হাত দিয়ে তিনটে চাপড় মারল ভালো করে বন্ধ করার জন্য। আর কিছুই না। পেছনে আকাশ, বনেটের সামনেটুকু আর বিমলের হাত। এ একটা আশ্চর্য জিনিস। তারপর এক পাগলের ব্যবহার আছে 'অযান্ত্রিক' ছবিতে। দুটো জায়গায় দেখা যাবে পাগলকে, দুটো বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাবে পাগল রাস্তার ধারে বসে রয়েছে। বিমলের গাড়ি তার সামনে দিয়ে চলে গেল। একবার ধুলো উড়িয়ে গেল, তারপর অনেক পরে ছবিতে দেখা গেল সে জল ছিটিয়ে

গেল, কেন-না বর্ষা গেছে! কিংবা হয়তো প্রথমবার জল ছিটিয়ে গেছে, দ্বিতীয়বার ধুলো উড়িয়ে গেল। কিন্তু দৃষ্টিকোণ একই, সবই এক। শুধু এই দু-জায়গায় দু-বার বিভিন্নভাবে এসে যেন একই গানের সুর দু-রকমভাবে শুনতে পেলাম আমরা। এরকম আশ্চর্য জিনিস 'অযান্ত্রিক'-এ বহু বহু জায়গায় রয়েছে।

'অযান্ত্রিক'-এর পর ঋত্বিক মাত্র ছ-খানা ছবি করার সুযোগ পেয়েছিল। তার মধ্যে আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়েছে মাত্র তিনখানা। 'কোমল গান্ধার' যখন দেখানো হয় তখন আমি কলকাতায় ছিলাম না। তারপর সে ছবি আর এমনই ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে দেখানো হয়নি। 'তিতাস'—বাংলাদেশে তোলা 'তিতাস' ছবি এবং ঋত্বিকের শেষ ছবি 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো' যখন দেখানো হয়েছে privately তখন আমার শুটিং-এর কাজ চলছে। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি। যাই হোক 'সুবর্ণরেখা' ছবি মনে আছে। ঋত্বিক আমাকে নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার পাশে বসিয়ে দেখিয়েছিল।

এই 'অযান্ত্রিক' থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ১৭-১৮ বছরে ঋত্বিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হবার সুযোগ কখনও হয়নি—যাকে বলে বেশ বসে আলাপ করা, আড্ডা মারা বা চলচ্চিত্রের নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা। সেই সুযোগ প্রায় আসেনি বললেই চলে। সত্যি বলতে কী ঋত্বিককে শেষ কবে সুস্থ দেখেছি সেটা চেষ্টা করে মনে করা কঠিন। তার কাজ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি; কিন্তু যাঁরা তার সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁদের মুখে শুনেছি যে সে কাজ করার সময়ও, অনেক সময়ই অসুস্থ থাকত। কিন্তু আমার কাছে যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে যে তার কোনো ছবি দেখে কখনও মনে হয়নি সেই অসুস্থতা একটুকুও, এতটুকুও সেই ছবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তার বিষয়বস্তু যেরকম বলিষ্ঠ তার বলার কায়দার মধ্যেও সেরকম জোর ছিল। এটা একমাত্র সম্ভব হয় তখনই যখন একজন শিল্পীর মধ্যে তাঁর বিশেষ শিল্পের আদবকায়দাগুলো একেবারে মজ্জাগত হয়ে থাকে। ঋত্বিকের মধ্যে সেটা ছিল। এবং সেই বিশেষ গুণটুকু না থাকলে আমার মনে হয় না মহৎ শিল্পী হওয়া যায়। ঋত্বিককে তাই খুব কাছাকাছি না-জেনেও, তার ছবি যখনই দেখেছি তখনই মনে হয়েছে একে আমি খুব ভালো করে চিনি এবং এ আমার খুব কাছের লোক।

আর একটা কথা বলে আমি শেষ করব—একটা বিশেষ গুণ ঋত্বিকের ছবির। আমরা যারা প্রায় গত চল্লিশ বছর ধরে ছবি দেখেছি, তাদের মধ্যে তো প্রায় ত্রিশটা বছর কেটেছে হলিউডের ছবি দেখে, কেন-না কলকাতায় তার বাইরে কিছু দেখবার সুযোগ ছিল না সে সময়টা। উনিশশো ত্রিশ বা পঁচিশ থেকে শুরু করে প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বা ষাট অবধি আমরা হলিউডের বাইরে খুব বেশি ছবি দেখতে পারিনি। আমাদের সকলের মধ্যেই তাই কিছু কিছু হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ঋত্বিক এক রহস্যময় কারণে সম্পূর্ণ সে প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল; তার মধ্যে হলিউডের কোনো ছাপ নেই। এটা যে কী করে হয়েছে, সেটা এখনও আমার কাছে রহস্য রয়ে গেছে। যদি প্রভাবের কথা বলতে হয়, আমার মনে হয় ঋত্বিকের ছবিতে কিছুটা—কিছু কিছু সোভিয়েট ছবির প্রভাব লক্ষ করা যায়। কিন্তু সে প্রভাবটা—প্রভাব মানে সেখানে অনুকরণ নয়; কারণ ঋত্বিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার

মৌলিকতা এবং সেটা সে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিল। এই সোভিয়েট ছবির প্রভাব এবং সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ছবির পরিসমাপ্তিতে নাটকের প্রভাব তার মধ্যে ছিল। এবং এই দুটো জিনিস দাঁড়িয়েছিল যে-ভিত্তির ওপর সেটা একেবারে বাংলার মাটিতে বসানো। ঋত্বিক মনেপ্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, বাঙালি শিল্পী ছিল—আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি। আমার কাছে সেইটেই তার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় এবং সেইটেই তার সবচেয়ে মূল্যবান এবং লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

উমানাথ ভট্টাচার্য

ঋত্বিকের উন্মাদনা, আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য

ঋত্বিকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বিখ্যাত উর্দু কবি পরভেজ শহেদির বাড়িতে, পানু পাল রচিত 'ভাঙা বন্দর' নাটকের রিহার্সালে। সময়টা যতদূর মনে পড়ে, উনিশশো পঞ্চাশের মাঝামাঝি। কমিউনিস্ট পার্টি তখন সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতির মায়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের গণ-সংগঠনগুলোকে ঢেলে সাজানোর পালা। গণনাট্য সংঘে নতুন জোয়ার। আমাদের গ্রুপে 'ভাঙা বন্দর' দিয়ে শুরু হল নবীন যাত্রা। প্রথম পরিচয়ে ওই রোগা লম্বা স্পষ্টভাষী মানুষটাকে কেমন লেগেছিল বুঝতে পারিনি। কিন্তু ক-দিন পরেই আবিষ্কার করলাম, ওর সঙ্গ না-পেলে সময়টা যেন ভালো কাটে না। ঋত্বিকেরও হয়তো তাই মনে হয়েছিল, নইলে ক-দিনেই আমরা অমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম কেমন করে? রিহার্সালে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গিয়ে হাজির হতাম। নাটককে উপলক্ষ্য করে আলোচনা হত শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সাধারণ ও বিশেষ সমস্যা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, মুক্তিযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও শান্তি...আরও কত বিষয়ে কত প্রশ্নের আদান-প্রদান চলত, মীমাংসায় পৌঁছোবার জন্য সে কী প্রয়াস। এখন ভাবতে মজা লাগে, ফুটপাতে বসে কথায়-কথায় রাত কাবার হয়ে গেছে, তবু কথার শেষ হয়নি। পরদিন বিকেল থেকে আবার সেই একই রুটিন। সঙ্গে রিহার্সাল, অভিনয়, গ্রুপকে চালু রাখার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম।

'ভাঙা বন্দর'-এর পর রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'। তারপর গোগোলের 'অফিসার' ('ইন্সপেক্টর জেনাবেল'-এর বাংলা রূপ)। উনিশ-শো বাহান্ন সাল। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিতে দেশময় শোরগোল বেঁধে গেল। আমরাও তাতে অংশ নিলাম, 'অফিসার' ও পানু পালের পোস্টার-প্লে 'ভোটের ভেট' সম্বল করে। নির্বাচন শেষ হল। কিন্তু কাজের শেষ নেই। কথারও না। থামতে দিল না ঋত্বিক। নতুন নাটক তৈরি করতে হবে। ক্লাস চালু করতে হবে। নতুন ছেলেমেয়ে জোগার করতে হবে। আরও কত কী। কর্মে উন্মাদ যদি কাউকে দেখে থাকি, সে ঋত্বিক। কিন্তু কীসের জন্যে এই উন্মাদনা? আত্মপ্রতিষ্ঠা? না। সে পথ ভিন্ন। ঋত্বিকের উন্মাদনা আদর্শের প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কোন্ সে আদর্শ? সমাজতন্ত্র। সাম্যবাদ। সেদিন হয়তো অত স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি, কিন্তু

খানিক বুঝেছিল নিশ্চয়ই। নইলে সারাক্ষণ কাজ-কাজ করে অমন পাগলের মতো ছুটে বেড়াতে পারত না।

এল ঋত্বিকের নিজের লেখা 'দলিল'। বাঙালি উদ্‌বাস্তুর মর্মন্তুদ কাহিনি। মর্মন্তুদ, কিন্তু শোকাচ্ছন্ন নয়। নাটকের শেষ সংলাপ—'বাংলারে কাটিছ, কিন্তু দিলেরে কাটিবারে নাই...।' এই ছিল তার স্পষ্ট ঘোষণা।

তখন অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন। দুশো বছরের পরাধীনতার অবসানে সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষ। হোক খণ্ডিত, তবু তো স্বাধীন। স্বাধীন ভারতের নতুন ইতিহাস রচিত হবে। নতুন সমাজ। আর সেই সমাজে নতুন মানুষ।

'দলিল' চলাকালে ঋত্বিক ছবির জগতে প্রবেশের পথ খুঁজতে শুরু করল। কারণ আশার কথা, স্বপ্নের কথা, আদর্শ-ভালোবাসা-ঘৃণা আর ধিক্কারের কথা বহুজনের কাছে পৌঁছোনো দরকার। নাটকের মঞ্চকে বড়ো সীমাবদ্ধ মনে হয়েছিল তার। নতুন চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করতে চলচ্ছবি সর্বোত্তম হাতিয়ার। অনেক দৈন্য-দুর্দশার মধ্যে সম্পূর্ণ হল ঋত্বিকের 'নাগরিক' ছবি (পুঁজির কারসাজিতে আজও এ ছবি মুক্তি পায়নি)। আমরা এদিকে নাটক নিয়ে আমাদের সাধ্যমতো কাজ চলিয়ে যাচ্ছি। জুলিয়াস ফুচিকের 'নোটস ফ্রম দ্য গ্যালোজ' অবলম্বনে 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে', তারপর 'শেষ সংবাদ'—নাটক নিয়ে আমাদের সময় কাটে। ঋত্বিক নতুন ছবিতে হাত দিল—'অযান্ত্রিক'। অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কমরেড হিসেবে ঋত্বিকের সঙ্গে যোগাযোগের অন্ত ছিল না, কিন্তু কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র। 'অযান্ত্রিক'-এর সময় থেকেই সে পুরোপুরি ফিল্‌মের লোক হয়ে গেল। ফিল্‌মের লোক, কিন্তু একেবারে অন্যরকম। চিত্রপরিচালক হয়েও লোকটা গাড়িবাড়ির স্বপ্ন দেখে না, টাকা করার কথা ভাবে না। টালিগঞ্জ স্টুডিয়ো পাড়ায় বসে লোকটা আদর্শের কথা বলে, নতুন সমাজ নতুন মানুষের কথা বলে। এ কেমন উদ্ভট মানুষ!

প্রথমটা উদ্ভট বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও স্টুডিয়ো পাড়ার প্রতিষ্ঠিতজনেরা অচিরেই বুঝতে পারলেন, এমন 'উদ্ভট' আর জনকয়েক এসে এ পাড়ায় আশ্রয় নিলে তাঁদের অবশ্যই পাততাড়ি গোটাতে হবে। তিরিশ বছরের পুরোনো আঙ্গিকে আরও তিরিশ বছরের পুরোনো কাহিনির প্যানপ্যানানি দিয়ে করে খাওয়া আর চলবে না।

শুরু হল প্রচার। ঋত্বিক পাগল, ঋত্বিক খ্যাপা। ওর দ্বারা কিছু হবে না। কিন্তু ঋত্বিক থেমে রইল না, ছবি করে যেতে লাগল একটার পর একটা। ফিল্‌মে-পাড়ার প্রতিষ্ঠিতজনেদের আক্রমণও তীব্রতর হতে লাগল। একটা সুস্থ স্বাভাবিক আদর্শবান কর্মীকে অচ্ছুৎ করে রাখার কী ছেলেমানুষি প্রয়াস! না কী, ছেলেমানুষি মোটেই নয়, স্বার্থবোধটাই সেদিন অমন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল ঋত্বিককে আঘাত করার জন্য।

মাঝে ঋত্বিক আবার এল তার 'সাঁকো' নাটক নিয়ে। নাটক দেখিয়ে প্রশংসা পেল অনেক, নাক সিটকোনোর লোকেরও অভাব হল না। আসলে এতদিন এপার-ওপার চিহ্নিত হয়ে গেছে, মাঝখানে ব্যারিকেড।

গণনাট্য সংঘের সেই দিনগুলোতে ফুটপাথে বসে যে-স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথা ভেবে সময় কাটত আমাদের, সেই দিনগুলো বোধহয় অনেক দূরে সরে যাচ্ছিল। ফিল্‌মের

জগতে সত্যজিতের আবির্ভাব একটা ঘটনা, কিন্তু ঘটনা বেশিদূর এগোল না। সব থেকেও একটা কীসের অভাব তাকে মাঝপথে দাঁড় করিয়ে দিল।

কিন্তু অন্যপক্ষে? অর্থ ও প্রচার যাবতীয় কূপমণ্ডূকতা, রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াকে মদত দিয়ে চলেছে। বেনোজলের স্রোতে ঋত্বিকদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, এই তাদের পণ।

পুঁজির বজ্জাতি সর্বদেশে সর্বকালে এইভাবেই নিজেকে প্রকাশ করেছে নিজের শ্রেণিস্বার্থের খাতিরে। কিন্তু দেশের মানুষগুলো? যে-মানুষকে নতুন চেতনা, নতুন সমাজ গড়ার প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেছিল ঋত্বিক, দেখেছিলাম, আমরাও, সে মানুষ কোথায়? 'অমানুষ' 'মৌচাক'-এর ভিড় সামলানো দায়, আর 'পালঙ্ক' নিঃশব্দে এল, কেউ চেয়েও দেখল না, তেমনি নিঃশব্দে অমানুষতরদের জায়গা ছেড়ে দেবার জন্য বিদায় নিল। কোথায় গেল সেই সম্ভাবনার মানুষগুলো?

সাহিত্যের বাজারে সাহিত্যই নেই, আছে পুঁজির খেলা আর প্রচার-বিশারদদের ঢক্কানিনাদ। অপসংস্কৃতির হাট বসেছে সারা দেশ জুড়ে। সেখানে মিষ্টান্নের দোকানে মাছি ওড়ে, তেলেভাজা বিকোয় সোনার দরে। ঢাক পিটিয়ে বাহবা দেয় বড়ো মালিকের বড়ো কাগজেরা। ঢাকের বাদ্যি শুনতে শুনতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে মানুষগুলো। গরলে ও অমৃতে পার্থক্যবোধ করতে ভুলে গেছে।

এই কি সেই মানুষ, যাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল ঋত্বিক, অনেক সম্ভাবনার কথায় রাত কেটে যেত রাস্তার মোড়ে ফুটপাথে বসে?

বড়ো আঘাত পেয়েছিল ঋত্বিক। অনুভূতির তীব্রতার কারণে সে দেখতে পেল না, অন্ধকারেও আলো আছে। অপসংস্কৃতির ভাঙা হাটে একদিন সংস্কৃতির মেলা বসবেই। বড়ো মালিকের বড়ো কাগজের ভাড়াটেদের ঢাকের বাদ্যি নয়, সেদিন সে মেলায় বাজবে সেতার-দোতারা-তম্বুরা। তারই প্রস্তুতি চলছে ঘরে-ঘরে। ঋত্বিক দেখতে পেল না। এইখানেই তার দুর্বলতা। এবং এই দুর্বলতাই তাকে পরবর্তী জীবনে অমন আত্মহননের পথে নিয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে ঋত্বিকের 'কোমল গান্ধার' তার পাগলামির (?) আর-একটি স্বাক্ষর হয়ে এল এবং গেল। মানসিক দিক থেকে ঋত্বিক প্রায় বিধ্বস্ত বলা চলে। আমি তখন বেকার। ঋত্বিক বলল একদিন, "বড়ো একা পড়ে গেছি, এসো আর-একবার চেষ্টা করে দেখি।"

লেগে পড়লাম ঋত্বিকের সঙ্গে সহযোগী চিত্রনাট্যকার ও প্রধান সহকারী পরিচালক হিসেবে। ছবির নাম 'সুবর্ণরেখা'। বহু বছর থিয়েটার করেছি একসঙ্গে, এবার ছবিতে। আগের সেই দিনগুলোর চেহারা পালটেছে অনেক, মানুষগুলো অন্যরকম। মানসিক আঘাতে জর্জরিত ঋত্বিক। কিন্তু কর্মে উন্মাদনার অন্ত নেই। একমাস (মে, ১৯৬২) চাকুলিয়ায় উদয়াস্ত পরিশ্রম করে শেষ হল 'সুবর্ণরেখা'। ছবি ভালো হয়েছে, এবার বোধহয় বিপথগামী দর্শকের মুখ ফেরানো যাবে ভালোর দিকে। সেই পুরোনো আশাগুলো আবার উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল মনের আনাচে-কানাচে। কিন্তু না, এবারে যে-আঘাত এল, তার থেকে নিষ্কৃতি পেল না কেউ। ঋত্বিক সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলল। সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের

যে-দুর্গ, তাতে ফাটল ধরেছে। তাহলে যে-বিশ্বাস যে-আস্থা নিয়ে এত স্বপ্নের সৌধ রচনা, সবই কি মিথ্যে?

সেই দুর্বলতা এবারও ঋত্বিককে সাদা-কালো চিনতে দিল না, অমানিশার অন্তে সূর্যোদয়ের সম্ভাবনাকে সে বাতিল করে দিল। একপেশে আচ্ছন্ন চিন্তায় থেকে আত্মহননের পথে সে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও দেখা হয়েছে ঋত্বিকের সঙ্গে। তখন সে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, শারীরিক ও মানসিক উভয়দিকে। আকুলভাবে প্রশ্ন করেছে (এখনও আমার কানে ভাসে) : এইভাবে শেষ হয়ে যাওয়াটা কি উচিত? হয়তো শেষ ক-দিন সে জনে-জনে এই একই প্রশ্ন ফেরি করে বেড়িয়েছে, কেমন সুন্দরভাবে জীবনটা শুরু করেছিলাম, এইভাবে শেষ হয়ে যাওয়া কি উচিত?

এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? পুঁজির দাপটে মানুষ দিশেহারা, সংস্কৃতির অঙ্গন কলুষিত। তবু আমরা যারা এখন বেঁচে আছি, আমাদের পরেও যারা বেঁচে থাকবে, আমার একসঙ্গে অন্তত একবারও কি ঋত্বিকের ওই শেষ প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না : না, কমরেড, জীবনটা এইভাবে শেষ হওয়া উচিত নয়, আমরা এইভাবে শেষ হতে দেব না।

মৃণাল সেন

ঋত্বিক ও আমরা

আমাদের একটা ছোট্ট দল ছিল তখন। সাতাশ বছর আগেকার কথা। একজন ছাড়া সবাই ছিলাম বেকার। কারুরই কোনো সংসার ছিল না, মা-বাবার সংসারে দায়িত্ব এড়িয়ে চলতাম সবাই। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়তাম, হাজরা রোডের ওপর ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে ভিড় করতাম, আট বাই বারো ফিটের মতো একটা ঘর, ন্যাড়া টেবিল আর ভাঙা চেয়ারে ঠাসা দোকান, নাম প্যারাডাইস কাফে। ঋত্বিক ছিল আমাদের দলের সবচেয়ে লম্বাটে সবচেয়ে রোগাটে এবং অবশ্যই সবচেয়ে ডাকসাইটে শরিক।

ঋত্বিক, সলিল চৌধুরী, তাপস সেন, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায় আর আমি : এই নিয়ে আমাদের দল। কখনো-কখনো বিজন ভট্টাচার্য এসে জুটতেন আমাদের আড্ডায়, কখনও বা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল আটটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত চলত একটানা আসর। দোকানি ঝাঁপ বন্ধ করতেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হত। আবার এসে জড়ো হতাম সূর্য ডোবার আগেই। গুচ্ছের চা গিলতাম, ভাগাভাগি করে এর ওর পকেট হাতড়ে ধার মেটাতাম, অবস্থার ফেরে ধারের অঙ্ক বাড়াতাম। আর কথা, কথা আর বক্তৃতা! যুক্তি তক্কো আর গল্পের ফোয়ারা। অঢেল, অশেষ। এসবের মধ্যমণি ছিল ঋত্বিক।

কী এত কথা বলতাম? দিনের পর দিন? যা কখনও ফুরিয়ে যেত না?

কী বলতাম না? সূর্যের তলায় যা কিছু ছিল সবই তুলে ধরতাম চায়ের টেবিলে, বিচারে আর বিশ্লেষণে মুখর হয়ে উঠতাম প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু বারবার নানা কথার মধ্যেও যে-প্রশ্নে, যে-তর্কে, যে-বিষয়ে ফিরে আসতাম তা হল সিনেমা। সিনেমা, সিনেমা আর সশস্ত্র বিপ্লব। সিনেমাকে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আমরা চলতে শিখেছিলাম সেদিন থেকেই। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অচঞ্চল বিশ্বাস রেখে সেদিন থেকেই আমরা অন্তঃসারশূন্য দেশজ সিনেমাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতে শিখেছিলাম, নতুন একটা ফ্রন্ট গড়ার জন্য মুখিয়ে উঠেছিলাম প্যারাডাইস কাফের ভাঙা চেয়ার-টেবিলে ঠাসা ওই ছোট্ট ঘরে, যে-ফ্রন্টে বিপ্লব আর সিনেমা হাত ধরাধরি করে চলবে। এই প্রাণচঞ্চল আসরগুলোয় যার গলা সবচেয়ে উঁচু পর্দায় বাঁধা ছিল সে হল ঋত্বিক।

ঋত্বিক ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেপরোয়া। কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা করত না ঋত্বিক, আগুপিছু ভাবার মতো ধৈর্য ছিল না। ধার আমরা সবাই করতাম। ধার করতাম কেন-না আমাদের কারুরই পকেটে পয়সা ছিল না। চা সিগারেট সবই আমাদের ধারে চলত, ধার করে সেই ধার মেটাতাম। ঋত্বিক চা খেত ঘন ঘন, সিগারেট খেত না। খেত বিড়ি। বিড়ি তখন এক পয়সায় তিন চারটে পাওয়া যেত। সেই বিড়িও ঋত্বিককে কিনতে হত ধারে। এক বিড়ির দোকানে শুধু বিড়ির জন্য ওর একবার ধার হয়েছিল আশি টাকা। ঋত্বিকের বেপরোয়া মেজাজের এ এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই মেজাজ পরবর্তীকালে ঋত্বিকের দর্শক প্রত্যক্ষ করেছেন 'অযান্ত্রিক'-এ, 'মেঘে ঢাকা তারা'য়, 'সুবর্ণরেখা'য়, ওর কথায় বার্তায়। ওর লিখিত বক্তব্যে।

সিনেমার রাজ্যে ঢোকা প্রায় যখন অসম্ভব মনে হচ্ছিল তখন আমরা সবাই ঠিক করলাম স্টুডিয়োর অসচ্ছল কর্মী ও কলাকুশলীদের নিয়ে একটি সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন দল গড়ে তুলব। শুরু হল আমাদের অভিযান। দল বেঁধে স্টুডিয়ো-স্টুডিয়ো ঘুরতাম, কর্মীদের বাড়ি বাড়ি যেতাম, বলতাম, বোঝাতাম, নিজেদের শক্তি সম্পর্কে ভালোবাসা ও প্রত্যয় জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চালাতাম এবং শেষ পর্যন্ত একদিন স্টুডিয়োর মধ্যে জোরালো আওয়াজ তুললাম। সেই আওয়াজী মিছিলের প্রথম সারির মানুষ রোগাটে লম্বাটে ঋত্বিক।

একদিন, রাতারাতি দেখা গেল, স্টুডিয়ো চত্বরে প্রচণ্ড উত্তেজনা। স্টুডিয়োর কর্মকর্তারা ঋত্বিকের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। কারণ, আগের দিন বিকেলে স্টুডিয়োর কর্মীদের এক সভায় ঋত্বিক বলেছে স্টুডিয়োর ভেতরে মদ্যপান চলবে না। ঋত্বিকের মতে এ এক অসহ্য বেলেল্লাপনা, এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে সংঘবদ্ধভাবে। কর্মকর্তারা খেপে উঠলেন, বললেন, ব্যক্তিগত জীবনে চারিত্রিক শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার ওপর তাঁদের কোনো হাত নেই, কিন্তু ঋত্বিককথিত এহেন ঢালাও অপবাদ অন্যায় এবং অশালীন। আমাদের বাকিরা সবাই তখন ঋত্বিককে নিয়ে পড়লাম, কী করে ওকে সামলানো যায়। ওকে সামলাই তো কর্তারা বেঁকে বসছেন, কর্তাদের নরম করি তো ঋত্বিক গরম হয়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা আয়ত্তে এল, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হল। কিন্তু মদ সম্পর্কে ঋত্বিকের ঘৃণা তীব্রতর হয়ে উঠল। অথচ এই মদই পরবর্তী জীবনে ওকে গ্রাস করে বসল, মদ থেকে আত্মমর্দন, আত্মমর্দন থেকে আত্মহননের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলল।

তখন গণ-আন্দোলনের জোয়ারে সারা পশ্চিমবঙ্গ তোলপাড়। একদিকে সংগ্রামী জনতা, কৃষক-মজদুর-মধ্যবিত্তের আপসহীন লড়াই অন্যদিকে শাসকের লাঠি, গুলি আর মারণযজ্ঞের নানা প্রক্রিয়া। কাকদ্বীপে লাল এলাকা তৈরি হয়েছিল সেই সময়ে। সেই সময়েই কৃষকরমণী অহল্যাকে তার পেটের বাচ্চাসমেত খুন করেছিল দেশজ পুলিস। এবং শহিদ অহল্যাকে স্মরণ করে ও সাধারণ মানুষের সংগ্রামী মননকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সলিল রচনা করেছিল এক মহৎ কবিতা—শপথ।

আমাদের ছোট্ট দলের সবাই ঠিক করলাম আমরা পালিয়ে যাব কাকদ্বীপে। আমরা শপথ নিলাম আমরা ছবি করব, নির্বাক ছবি, ষোলো মিলিমিটারে তুলব, লুকিয়ে লুকিয়ে কলকাতার কোনো ল্যাবরেটরিতে সেই ছবি ধোলাই করব, সম্পাদনা করব। তারপর

লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রামে গ্রামে দেখিয়ে বেড়াব। আমি চিত্রনাট্য লিখলাম, সলিল নামকরণ করল 'জমির লড়াই', ঋত্বিক ভাঙা একটা ক্যামেরা জোগাড় করল। কাকদ্বীপে অবশ্য যাওয়া হল না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সেই সুযোগে ক্যামেরাটাকে, তা সে যতই প্রাচীন আর ভাঙা হোক না কেন, নাড়াচাড়া করতে পেরে ঋত্বিক ছবি তোলার কলাকৌশলের অনেকটা রপ্ত করে নিল।

আমরা ঝগড়াও করেছি প্রচুর। তখন এবং পরবর্তী জীবনে। ঝগড়া করেছি, মতান্তর ঘটেছে মনান্তর ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে এক এক সময়ে, আবার সময় আর ঘটনার মধ্য দিয়ে মিশে গিয়েছি আগেকার মতোই, এক সঙ্গে চলেছি।

ছেলেমানুষি করেছি অনেক : আমি, ঋত্বিক, আমরা সবাই। ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয়ও দিয়েছি সবাই। অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটিয়েছি একাধিক। পরে বুঝতে পেরেছি, পুরোনো সম্পর্কে ফিরে যেতে চেষ্টা করেছি আপ্রাণ।

ফেব্রুয়ারির ছ-তারিখে রাত এগারোটা পাঁচ মিনিটে ঋত্বিক মরে গেল। ও মরবে আমরা জানতাম। ঋত্বিক নিজেও জানত। চব্বিশে ডিসেম্বর শেষবারের মতো জ্যান্ত অবস্থায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমাদের বাড়িতে যখন এল, দেখলাম ও ধুঁকছে। ধুঁকতে ধুঁকতে কথা বলছে, হাসছে। অনেক খেল, বলল, মদ আর খাব না। আবার বলল : আর বেশি দিন বাঁচব না। বলল : এ যাত্রায় তো টাঁসলাম না। দেখা যাক।

ঋত্বিক সেদিন আমাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু ওর পাশে আমি দাঁড়িয়ে ও তখন মরছে। কোমায় আচ্ছন্ন ঋত্বিক, দামাল ঋত্বিক, বেপরোয়া ঋত্বিক, অসহিষ্ণু ঋত্বিক, বিশৃঙ্খল ঋত্বিক। ঋত্বিক মরল।

কে জানে, হয়তো মরেই ঋত্বিক বাঁচল। শেষ ক-টা বছর ঋত্বিকের বেঁচে থাকাটাই একটা বিরাট অঘটন।

গুরুদাস ভট্টাচার্য

ঋত্বিক ঘটক : গঙ্গা থেকে সুবর্ণরেখা থেকে তিতাস

ভূমিকা

সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, চলচ্চিত্রে তেমন সত্যজিৎ রায়—দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অনেক আগেই কথাটা মেনে নিয়েছিল বাঙালি দর্শক ও সমালোচক। ঋত্বিক ঘটকের কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে কবি নজরুল ইসলামকে। কাজীর মতো বেহিসেবি জীবন, বেপরোয়া মেজাজ, টেনশন, জনতার জন্যে অসীম বেদনা ও মমতা : 'বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী'।

শ্রীঘটকের ছবির বিষয়বস্তু, অতএব, তাৎক্ষণিক, সমকালীন, সংকটের ও সংগ্রামের; চলিষ্ণু সমাজকে-সময়কে ধরে রাখা স্থায়ী শিল্পদৃশ্যে। বছর দশেক আগে বোম্বের হামীদউদ্দীন মেহমুদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : "মানুষের অবক্ষয় আমাকে আকর্ষণ করে। তার কারণ, এর মধ্য দিয়ে আমি দেখি জীবনকে- গতিকে-স্বাস্থ্যকে। আমি বিশ্বাস করি জীবনের প্রবহমানতায়। আমার ছবিতে চরিত্ররা চিৎকার করে বলে : 'আমাকে বাঁচতে দাও'। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সে বাঁচতে চায়—এ তো মৃত্যু নয়, জীবনেরই জয়-ঘোষণা।"

যে-কোনো মুহূর্তে পরমাণু বোমা পড়তে পারে; একটি ঘরে আটক অনেকগুলি মানুষ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নরনারী; সময় এগিয়ে আসে, মুহূর্তটি হয় বিস্ফোরক, মানুষগুলি আতঙ্কিত; মৃত্যুভয়ে ভীত তারা মনের কথা বলে ফেলে; যা ছিল অন্তরে, বেরিয়ে আসে বাইরে, ফুটে ওঠে আসল চরিত্রগুলি, অল ক্লিয়ার!—ছবির নাম 'ফীয়ার', পুণা ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তুলেছিলেন উপাধ্যক্ষ ঋত্বিক ঘটক। ছোটো ছবি। এরই মধ্যে সমাজ-সংকটের সমুদ্রোপম ব্যঞ্জনা, তার মুখোমুখি মানুষের আতঙ্ক। শ্রী ঘটকের ছবির পর ছবিতে এই এক বিষয়বস্তু নানা রূপে ও রসে। তিনি তাৎক্ষণিকের ছবিকর, বর্তমানের কবি।

কিন্তু এই তাৎক্ষণিকতাতেই যেমন নজরুলের শেষ নয়, তাঁর গানে কবিতায় আছে চিরকালের কথাও। তেমনি, শ্রীঘটকের সচিত্র বক্তব্যও সুদূর ভবিষ্যতে প্রসারিত, সমকালকে ধারণ করে তারই মধ্যে সর্বকালের একটি মহত্তর বৃহত্তর ব্যঞ্জনা। সত্যি কথা

বলতে কি, এই ব্যঞ্জনা ভারতের আর কোনো পরিচালকের ছবিতে নেই। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতেও না।

ছবির জগতে

পঞ্চাশোর্ধ ঋত্বিক ঘটকের আদি বাড়ি পূর্ববাংলা অধুনা বাংলাদেশ। ঘটক পরিবার এসে বাসা বাঁধে পশ্চিমবাংলার বহরমপুরে। সমগ্র পরিবারটিই সাহিত্য ও শিল্পমনস্ক। ১৯৪৮-এর স্নাতক শ্রীঘটক যুক্ত হলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে। নাটক-অভিনয়-কলাকুশলতার কাজ। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী 'সাঁকো' মঞ্চে বহুবার অভিনীত। কলকাতা বেতারে প্রচারিত 'জ্বালা' চমকে দিয়েছে শ্রোতাদের। তার অনেক আগেই তিনি এসেছেন ছবির জগতে, অন্তরের তাগিদে।

সম্ভবত ১৯৫০। 'তথাপি'র পরিচালক মনোজ ভট্টাচার্যর সহকারী। পরের বছর করলেন 'বেদেনী'। তারপর বোম্বের ফিল্মিস্তান স্টুডিয়োয় কাহিনি ও চিত্রনাট্য বিভাগে। অন্য পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করেছেন। এবং পুণা ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউটে। স্ব-অধীন কাজ 'নাগরিক' (১৯৫৩)। 'বেদেনী'র মতো 'নাগরিক'ও মুক্তি পায়নি। তবে, চিত্রনাট্য পড়েছি—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের। তার দুঃখদহনের, নিরাপত্তা বোধহীনতার, আত্মারও আত্মহননের বাস্তব চিত্রায়ন। একের মাধ্যমে বহুর ব্যঞ্জনা—শ্রীঘটকের জীবন-চেতনার ও তার প্রকাশের বৈশিষ্ট্য। হাওড়া ব্রিজ তার প্রতীক এবং সম্ভবত 'নবান্ন' এর প্রেরণা।

পরবর্তী ছবি, পাঁচ বছর পরের 'অযান্ত্রিক' ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে এবং অন্যত্র দেখানো হয়েছিল 'ইট্‌স নট এ মেশিন' নামে। ইউনেস্‌কো থেকে প্রকাশিত 'ইনডিয়ান ফিল্ম অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন অডিয়েন্‌স্' গ্রন্থে পোলিশ চলচ্চিত্রবিদ জার্জী ত্যেপলিজ লিখেছেন : "আপাতদৃষ্টিতে 'অযান্ত্রিক'-এর কাহিনি এক ড্রাইভার ও তার ঝরঝরে ট্যাক্সি নিয়ে। আসলে, এটিতে একটা বিরাট সমস্যা প্রতিফলিত; তা হল, যন্ত্রশিল্প ও কারুশিল্পীর সংঘাত, যার অনিবার্য ফল—বিচ্ছিন্নতা।" শুধু বক্তব্য নয়, তার চেয়েও বেশি—এই ছবির দ্বিতীয় অর্থ। সুবোধ ঘোষের কাহিনিকে অধিকতর ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন পরিচালক শহুরে মানুষ ও গ্রাম্য আদিবাসীদের বিপরীত চিত্র দেখিয়ে। টেকনিকের ক্ষেত্রেও প্রতিভার স্বাক্ষর ছোটনাগপুরের উঁচুনীচু ল্যান্ডস্কেপে, শিল্পী নির্বাচনে, সংগীতের (আলি আকবর) প্রয়োগে, শব্দের যোজনায়—যেমন : কবরখানার অদৃশ্য শোকক্রন্দন বা গাড়ির চলার আওয়াজ। বাঁশের পোল ও হাওড়া ব্রিজ, গ্রাম-বাংলা ও শহর কলকাতার বৈপরীত্য তাঁর শিশু-চিত্র 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'-তেও। অবাধ প্রকৃতি-প্রায় সমান মাপের বাড়ি দেখতে অভ্যস্ত গ্রামের ছেলে কাঞ্চন কলকাতায় এসে দেখে উঁচু-উঁচু বাড়ি, পাশেই নোংরা বস্তি, ভালো লাগার মতো লোক, মন্দ লাগারও। নানান অভিজ্ঞতা। বিপর্যস্ত চিত্ত। নিহত কল্পনা। পথের ওপর পড়ে থাকে একটা মরা চিল। প্রত্যাবর্তন।

পরবর্তী তিনটি ছবিই (যথাক্রমে শক্তিপদ রাজগুরু, স্বরচিত ও রাধেশ্যামের কাহিনি অবলম্বনে) উদ্‌বাস্তু জীবনভিত্তিক। দরিদ্র সংসারটিকে কোনোক্রমে দাঁড় করিয়ে রাখে নীতা। বাবা-মাকে সাহস দেয়, ভাই-বোনকে সহায় দেয়, উৎসাহ দেয় দাদাকে সংগীতচর্চায়। কঠিন দুঃখেও মুখে হাসি। কিন্তু যেদিন তার প্রেমিক সনৎ তাকে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে করল তারই ছোটো বোন গীতাকে, অসহ্য হয়ে উঠল দিন-রাত্রি। যক্ষা; স্যানাটোরিয়াম; মৃত্যু। এ মৃত্যু সে চায়নি; এর জন্যে দায়ী সমাজেরই বহুতর পাপ—অপরাধ। মা-বাপ চায়, রোজগেরে মেয়ে আইবুড়ো থাকলেই ভালো; সনৎ চায় গ্ল্যামার; গীতা চায় স্বাচ্ছন্দ্য। সবাই স্বার্থপর। সততা-ন্যায়-মমতা থেকে বিচ্ছিন্ন। শুধু বাইরে নয়, মনে মনেও সকলেই উদ্‌বাস্তু। অন্ধকারের প্রাণী। যদিও আলোর আকাঙ্ক্ষা আছে।

ছবিটির দৃশ্য পরিকল্পনার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। আলো-আঁধারী মাঠে বসে বসে নীতা ও সনৎ হাতে হাত রাখে, সেই মুহূর্তেই অদূরে একটা ট্রেন হুহু করে চলে যায়। সনতের অফিসঘরে গীতাকে আবিষ্কার করে শূন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে নীতা, চারপাশে তীব্র হুটিং ককিয়ে-কান্নার মতো। ঘরে দাদার গান 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে'; গান শেষ, অন্ধকার। কিংবা, কঠিন সড়কের ওপর সস্তা মেয়েলি জুতোর স্ট্যাপ ছিঁড়ে যাওয়া। অথবা, উঁচু পাহাড়, তুমুল বর্ষণ, প্রচণ্ড শব্দ, দাদার মুখোমুখি নীতার কূলহীন জিজ্ঞাসা : 'আমি বাঁচবো দাদা!' ছবি শেষ : 'মেঘে ঢাকা তারা'।

গহীনতম বেদনার একটি নিগূঢ় অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'। এই বিমূর্ত বেদনাকে দেশমাতার আত্মায় সঞ্চারিত করেছেন বিষ্ণু দে একই নামের কাব্যগ্রন্থে। তারপর ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' যার "মূল সুর ছিল দুই বাংলার মিলনের। তাই অবিরত বেজেছে প্রাচীন বিবাহের সুর" (ঋ.ঘ.)। দেশভাগ; উদ্‌বাস্তু। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তৈরি নাটুকে দলেও ভাগাভাগি; একদল বিখ্যাত ক্লাসিক নাটকের পক্ষে, অন্যদল চায় বাস্তবের মঞ্চরূপ। ভৃগু পরিচালক; অনসূয়া শিল্পী; দুজনের মধ্যেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। দুই দেশ, দুই দল, দুটি হৃদয়—যথাক্রমে রাজনৈতিক ব্যর্থতা, গণনাট্য সংঘের অস্থিরতা। স্বাধীন প্রেম—একই সঙ্গে, একইভাবে দুলছে, ধাক্কা খাচ্ছে, বারে বারে ছুঁয়ে যাচ্ছে; মিলে যাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে। অনসূয়ার দ্বিধা, সে তো নবনাট্যেরই দ্বিধা; ভৃগু অনসূয়ার প্রেম-প্রত্যাখ্যান-পরিণয়, সে তো দুই বাংলার যোগ-বিচ্ছেদ-পুনর্মিলন। লালগোলার গঙ্গার তীরে এই ভাবনারই দৃশ্যরূপ; নদীবক্ষে নৌকো, নৌকোর ছেলেরা, তীরে অনসূয়া, অনসূয়ার মুখ কঠিন, কঠিন রেললাইন, ক্যামেরা ট্রাক করে লাইনের ওপর দিয়ে, ট্রেন চলার যান্ত্রিক শব্দ গতি দ্রুত, অদৃশ্য কণ্ঠে দুর্বোধ্য চিৎকার—বাফার! ওপার রইল ওপারেই, এপারের স্বপ্নভগ্ন! ভৃগু-অনসূয়া তাই প্রতীকী।

বাস্তুচ্যুত মানুষগুলি বাসা বেঁধেছে রিফিউজি কলোনিতে। ঈশ্বরের নেতৃত্বে দিন কাটে সুখে-দুঃখে-সংগ্রামে। একদিন ঈশ্বর চলে যায় বাইরে কাজ পেয়ে, সুবর্ণরেখার তীরে। সংসারে বোন সীতা, অন্ত্যজ অভিরাম। একসঙ্গে বড়ো হয়, খেলা, গান, সংলাপ। খুশি হয়

রাঢ় অঞ্চলের রুক্ষ খোয়াই, আশ্চর্য-কোমল নদীর সান্নিধ্যে। ভয় পায় বহুরূপীকে দেখে কিংবা পরিত্যক্ত এয়ারপোর্টের অদৃশ্য বিভীষিকায়। বড়ো হয়। সীতা-অভিরাম ভালোবাসে পরস্পরকে। ঈশ্বর এখন উচ্চপদস্থ, তার মর্যাদায় বাধে। বাধা দেয়। ওরা চলে আসে কলকাতায়, বিয়ে করে নতুন ঘর বাঁধে। কিন্তু ঘর আবার ভেঙে যায়, অভিরাম দুর্ঘটনায় নিহত হয়। শিশুপুত্রকে বাঁচাতে সীতা হয় দেবব্যাবসায়িনী। ঈশ্বরও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বন্ধুর সঙ্গে স্ফূর্তি করতে শহরে আসে, বার থেকে বারবণিতালয়ে—সীতা! আর্ত কান্নায় ওঠে ঈশ্বর; কাটারি দিয়ে আত্মহত্যা করে সীতা। মা-বাপ-হারা শিশুটির হাত ধরে সুবর্ণরেখার তীর ধরে দিগন্তের অভিমুখে হাঁটতে থাকে ঈশ্বর। উদ্‌বাস্তু থেকে বসতি থেকে উদ্‌বাস্তু।

উদ্‌বাস্তু থেকে বসতি থেকে উদ্‌বাস্তু—বারে বারে এই চলতে থাকে বাইরের জীবনে, অন্তরের গহনে; আমি যা তা থেকে কেবলই অন্যরকম হয়ে যাওয়া। আজকের প্রতিটি মানুষ এইরকম উদ্‌বাস্তু: ক্ষণে ক্ষণে তার জীবনের ছবি বদলায়, মননের চরিত্র বদলায়। সংকট এইটেই, এইখানেই। তাই 'সুবর্ণরেখা' নিছক একটি কাহিনিচিত্র নয়, একটি জীবন-গাথা, 'ক্রনিক্‌ল্ পিকচার'। তাই তার ক্রেডিট টাইটেল উন্মোচিত হয় পুরোনো পুথির পাতায়-পাতায়। এ-ছবি একই সঙ্গে 'ক্ষণকালের শিল্পদৃশ্য' এবং 'চিরকালের রূপশ্রী'। উদ্‌বাস্তু সমাজের এবং উদ্‌বাস্তু ব্যক্তিত্বের চিত্ররূপ মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত। সে বলে, "একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের দেখা হল, এ ধরনের গল্পে আমার রুচি নেই। আমি আপনাদের ঘা দেব এবং বোঝাব, যে এ কাহিনি কাল্পনিক নয়। বলব চোখের সামনে যা দেখছেন, তার অন্তর্নিহিত বক্তব্য, আমার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করুন। যদি সচেতন হন, আমার উত্থাপিত প্রতিবাদ উপলব্ধি করতে পারেন বাইরে বেরিয়ে বাস্তবকে বদলে দেবার চেষ্টা করেন, তাহলেই সার্থক আমার ছবি করা (ঋ.ঘ.)।

এ ছবিব সামনে বসে দর্শককে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়। যেহেতু, এর প্রথম স্তরে কাহিনি-চরিত্র, দ্বিতীয় স্তরে বলিষ্ঠ বক্তব্য, তৃতীয় স্তরে এক আশ্চর্য প্রয়োগকলা। সব মিলিয়ে থ্রি ডাইমেনশন। এবং এইখানেই ঋত্বিক ঘটক অনন্য। তৃতীয় নয়নের অধিকারী তিনি।

মহাকাব্য উপমা

জড় প্রাণের কল্পনা, প্রাণী ও জড়ের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার ভাবনা, ঘরের শিশু ও মাঠের শস্য ও অরণ্যের শাবকের আবির্ভাব-তিরোভাবকে ঘিরে মৃত্যু-পুনর্জন্মের তত্ত্বরচনা ও তন্নিষ্ঠ আচার অনুষ্ঠানকৃত্য তথা উৎসবাদি : এসবই আদিম যুগের জীবনসংগ্রাম ঘনিষ্ঠ জীবনদর্শন। সে যুগকে আমরা অনেকদিন পেছনে ফেলে এসেছি, কিন্তু সেই আদিম সংস্কার-বিশ্বাস-ভয় আজও আমাদের আগেই নিত্যসঙ্গী, ভালো ও মন্দ, দুই রূপেই। রাজনৈতিক-আর্থিক-সামাজিক কার্যকারণে তার চেহারা-চরিত্র বদলে গেছে। আদিমতার কেবলই নবীভবন হচ্ছে। এই বিবর্তমান বৃত্তি একান্ত বাস্তব; আমাদের

প্রত্যেকের মধ্যে, বর্তমান বৃত্তির সঙ্গে, নানা নামে-রূপে অহরহ সক্রিয়। একমাত্র বাস্তবের গভীরে গেলেই এর সন্ধান মেলে; গভীরে যেতে গেলেই এর সন্ধান করতে হয়। তখন দেখা যায়, আজকের যুগে কত যুগান্তরের প্রগাঢ় স্পর্শ, অদ্যতনীতে কী ব্যাপক আদিম ঐতিহ্য, জীবনের মানসের কী আদিগন্ত বিস্তার বৈচিত্র্য! এর উন্মোচনে শিল্পের ডাইমেনশন বেড়ে যায়, তার বাস্তবতা বুকের মধ্যে, রক্তের মধ্যে গিয়ে ধাক্কা দেয়। আমরা চিনি, জানি নিজেকে, চারপাশকে, প্রয়োজন হলে, নিষ্ক্রমণের পথ সন্ধান করি।

সমাজ-সংস্কৃতির এই রহস্যটিকে—ফ্রেজার ও ফ্রয়েডকে মিলিয়ে—প্রথম আকার দেন সিজি ইয়ুং তাঁর 'সমষ্টিকে অসংজ্ঞান' তত্ত্বে। তাকে মনস্তত্ত্বের জটিলতায় নিয়ে যান এরিক নিউম্যান; সাহিত্যে 'মিথ ক্রিটিসিজম্'-এর জন্ম দেন নর্থপফ্রইং এবং মার্কসীয় আলোকে, অর্থনীতির পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেন ক্রিস্টোফার কডওয়েল। এই অসংজ্ঞান তত্ত্ব যখন শিল্পে প্রযুক্ত হয়, তখনই 'মাইথোপিয়া' বা উপকথা-বৃত্তির চূড়ান্ত সার্থকতা। সাহিত্যে, সুকুমার কলায়, প্রায়োগিক শিল্পে এর প্রয়োগ অজস্র, বিবিধ বিচিত্র। এবং চলচ্চিত্রেও যদিচ, সংখ্যালঘু। এই সংখ্যালঘুদের অন্যতম ঋত্বিক ঘটকের ছবি।

শ্রীঘটক এবিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, ভেবেছেন, লিখেছেন। সিনে ক্লাবের মুখপত্র ইংরেজি 'কিনো'র প্রথম সংখ্যার জন্যে লেখা সংগ্রহ করতে গিয়ে একাধিক দিন এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি। যাঁরা তাঁর ইংরেজি-বাংলা প্রবন্ধ পড়েছেন, তাঁরা জানেন মানব-অস্তিত্ব বিষয়ে এই পরিপূর্ণ ও সর্বায়ত ভাবনা ভারতের আর-কোনো পরিচালকের সৃষ্টিকর্মে নেই, মৃণাল সেনও আইপিটিএ সংশ্লিষ্ট; তাঁর ছবিতে জীবনের যে-ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা, তার সীমা নেহাতই বর্তমানের বিন্দু, তার বাইরে কোনো বিস্তারিত ডাইমেনশন নেই। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে মনের যে বিশ্লেষণ দেবার প্রয়াস, তার আশ্রয় ঊনবিংশ শতকের ভিক্টোরীয় উদার মানবতাবোধ। তার তলদেশে কোনো গভীরতর ডাইমেনশন নেই। এঁদের সৃষ্টি আমাদের মনকে-মননকে নাড়া দেয়, এগিয়েও দেয় বেশ-কিছুটা, তার বেশি না। সমগ্র মানবসমাজের প্রতি মানব-সংস্কৃতির প্রতি এক অনিবার্য একাত্মবোধে উত্তীর্ণ করে দেয় না—যেমন করে বুনুএলের একটি ছবি, বিদেশি মিথ-আশ্রিত হয়েও। শ্রীরায় বা শ্রীসেনের ছবি আমাদের বাধ্য করে আশপাশে তাকাতে, নিজের মধ্যে নজর ফেলতে; কিন্তু হাজার-হাজার বছরের মানবিক অস্তিত্বের রহস্য আমরা উপলব্ধি করি না। উপকথাবৃত্তির অ-প্রয়োগে ছবির সেই অলৌকিক ক্ষমতা জন্মায় না। ফলে, তার বাস্তবতা দর্শকের অনুভবের গণ্ডিতে, অনুভবকালের গতিতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ক্ষণিকের আনন্দ পরিণত হয়ে যায়। ক্ষণিকের আনন্দ পরিণত হয় চিরকালের অতৃপ্তিতে। ওঁদের ছবির সমালোচনায় এ কথা আমি বরাবরই, বারে বারে বলেছি। বিপরীত পক্ষে, ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে আছে মহাকালের ডাইমেনশন; আর, তা আছে বলেই তাঁর সৃষ্ট চিত্র-বাস্তবতা আমাদের রক্তের মধ্যে খেলা করে, আমাদের নিয়ে যায় অতিশয় বাস্তবের কেন্দ্রভূমিতে, মানুষের জীবনের-ইতিহাসের একেবারে সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে শ্রীঘটক আজও দ্বিতীয় রহিত, এই মাইথোপিয়ার প্রয়োগে।

সৃষ্ট শিল্পকে আশ্রয় করেই মাইথোপিয়া তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ করেছে শিল্পকে। আবার, শিল্প অতিক্রান্ত করেছে তত্ত্বকে। অর্থাৎ, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে,

মাইথোপিয়া যে কেবলই আদিম বা পৌরাণিক উপকথাকে ঘিরেই স্ফূর্তি লাভ করে, তা নয়, তার আগে বা পরেও যাতায়াত করতে পারে, তত্ত্বকথা রূপকথা এমনকি ইতিকথাকে আশ্রয় করেও তার ডাইমেনশন বাড়াতে পারে। এই ব্যাবহারিকতার সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত বেরটল্ট ব্রেখ্ট। তাঁর 'এপিক থিয়েটার'-এ যেমন আদিম ও গ্রিক নাট্যকলা ও ভাবনা আছে, তেমনি আছে মধ্যযুগীয় ও শেকস্‌পিয়রীয় নাট্যভাবনাও। নতুবা, সেন্ট জোয়ানকে নিয়ে অমন মারাত্মক নাটকটি লিখতে পারতেন না। চলচ্চিত্রে এর বড়ো দৃষ্টান্ত সার্গেই আইজেনস্টাইন। প্রতিটি ছবিতে তিনি যেভাবে প্রতীক ব্যবহার করেছেন, বিশেষত গ্রোটেস্‌ক এবং বিবিধের সমবায়ে মন্তাজকে বিকশিত করেছেন। সেসবই মাইথোপিয়ার নবরূপান্তরণের সাক্ষ্য। 'ব্যাট্‌লশিপ পটেমকিন'-এর অন্তর্নিহিত মূল, একদিকে যেমন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সেই ত্রিতয় সূত্র, অন্যদিকে তেমনি আদিম ত্রৈত ভাবনা জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম। শহিদশিবিরে অবিরত লোকযাত্রা, লোকায়ত মাত্রারই ছন্দিত চিত্ররূপ। অথচ, ঘটনাটি হালফিলের ইতিহাস। তুলনায় 'আইভ্যান দ্য টেরিব্‌ল' প্রাচীন এবং তার কাহিনি ও উপকথায় বিস্তারিত। আইজেনস্টাইন যেভাবে সমস্ত ঘটনাকে সাজিয়েছেন, জাতীয় আর্টের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, চিত্রকল্প ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন, দৃশ্য সমাবেশ করেছেন (দেয়ালে প্রতিফলিত মাথার ছায়া, কিংবা গির্জাব মেহরাবদরে অলিন্দে দাঁড়িয়ে আইভ্যান, দূর থেকে দলে দলে প্রজারা আসছে, ইত্যাদি), মূল চরিত্র নতুন অর্থ তো পেয়েছেই, সমস্ত চিত্রকাহিনিই তথা ইতিহাস নব উপকথা হয়ে উঠেছে। ফলে, রাশিয়ান উপকথায় অনভিজ্ঞ দর্শক ছবি দুটিতে, সমগ্র মানবজাতির নৈকট্য অনুভব করেন। প্রথমটি আবেশ, দ্বিতীয়টিতে বুদ্ধিবৃত্তির অধিকতর সহযোগিতা প্রার্থনীয় হয়। বস্তুত মার্কসীয় দর্শনেও অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ একসূত্রে গ্রথিত : প্রথমদুটির যোগ ও গুণফলেই তৃতীয়ের আবির্ভাব। 'অযান্ত্রিক'-এই উপকথাবৃত্তির প্রথম সার্থক প্রমাণ। মা-হারানো বিমলের কাছে ট্যাক্সি জগদ্দলই তার মা; ঠিক যেমন, ধার্মিক হিন্দুদের কাছে গাভিমাত্রেই মাতা-ভগবতী; গো-মাতা থেকে এখন গাড়ি-মাতা। এই পাগলের মতো গাড়ি-প্রীতি গো-ভক্তির মতোই একটা আদিম বিশ্বাস, তার নবরূপ— জন্তু থেকে যন্ত্র, অ্যানিমিজ্‌ম থেকে ফেটিশিজ্‌ম। অ্যানিম্যাল-ফেটিশিজ্‌ম থেকে মেশিন ফেটিশিজ্‌ম : সেই আদিম মানবেরই অন্যতম রূপ বিমল। এই রহস্যটা বোঝাবার জন্যেই ছবিতে আনা হয়েছে আদিবাসী ওরাওঁদের আচার-উৎসব, যার মূল তত্ত্ব, সেই তত্ত্ব, সেই আদিম মৃত্যু-পুনর্জন্ম ভাবনাকে ঘিরে। একদিকে সেই পুরোনো ঐতিহ্য, অন্যদিকে তার আধুনিক রূপ। এক আবার এক নয়ও—মাঝখানে অর্থনীতিক পালাবদলের বিপুল ইতিহাস।

'মেঘে ঢাকা তারা'য় যে আগমনি-বিজয়ার গান, তাও ওই মৃত্যু পুনর্জীবনের গান। শ্রীঘটক নিজেই বলেছেন : "নীতা আজ পর্যন্ত আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। তাকে আমি কল্পনা করেছি শত শত বছরের বাঙালী ঘরের গৌরীদান দেওয়া মেয়ের প্রতীক রূপে।" আট বছরের মেয়ের বিয়েকে বলে 'গৌরীদান'; পুরাণের দেবী গৌরী উমার এই বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। কন্যাকে 'গৌরীদান' করে বাপ-মা অসীম পুণ্য সঞ্চয় করতেন (আজও লুকিয়ে করেন অনেকে; আইন না-থাকলে আরও অনেকেই

করতেন!) কন্যার হত বলিদান। শ্রীঘটক বয়সটাকে বাদ দিয়ে বলিদানটিকেই গ্রহণ করেছেন (আজ যে বাপ-মা পুণ্যার্জনের লোভকে বাক্‌বন্দি করে রেখে উপার্জনশীলা কন্যার চিরকুমারীত্ব কামনা করেন, সেও তো আর-এক বলিদান। এবং এই দিক থেকে নীতা বলির অর্ঘ্য। তাই নীতা গৌরী-উমা; তার জন্ম জগদ্ধাত্রী পুজোর দিনে; খবর এল যখন তখন বিজয়ার গান হচ্ছে—জন্মের সঙ্গেই মৃত্যুর দ্যোতনা; তার স্বামী মহাকাল, মহাদেব, পাহাড় যাঁর প্রতীক, সেই পাহাড়ের কোলেই তাঁর শেষ নিশ্বাস। শিব-গৌরীর উপকথাকে বিপরীত আবর্তে প্রয়োগ করে (এও একটি শৈল্পিক পদ্ধতি) শ্রীঘটক বর্তমানের কথাকে রূপায়িত করে দিলেন চিরকালের উপকথায়। শিব-গৌরীর যে-মিলন নিয়ে আসে সুখ পরিণতি, যে-মিলনের আকাঙ্ক্ষা মেয়েলি ব্রতে বিবাহার্থিনী কুমারীর কণ্ঠে সপুলকে উচ্চারিত (...'শিবের মতো স্বামী পাব'), 'মেঘে ঢাকা তারা'য় সেই মিলনের নাম অন্য, রূপ অন্য সে তো সুখ পরিমাণ নয়, সে জীবন-বিচ্ছিন্ন মৃত্যু, সে বুকভরা আকাঙ্ক্ষার নির্মম হনন। মহাকাল শিবের সামনে দাঁড়িয়ে উমার কণ্ঠে এ হাহাকার বাজত না, নীতাদের কণ্ঠে বাজে। একটি সুপরিচিত উপকথাকে আশ্চর্য তির্যকভাবে ব্যবহার করে পরিচালক তাকে নতুন অর্থে উজ্জীবিত করেছেন, এবং এর-দ্বারা আজকের ট্র্যাজেডিকে যে সীমাহীন ব্যঞ্জনা দিয়েছেন, তার তুলনা অন্তত আমি তো কোনো ভারতীয় ছবিতে পাইনি। অথচ, একমাত্র তিনিই তুলেছেন 'আমার লেনিন'।

'কোমল-গান্ধার'-এও উপকথাবৃত্তির এই দান্দ্বিক রূপ একই সঙ্গে 'ডায়ালেক্‌টিক্‌স ও 'ডিকটমি'—লক্ষণীয়। নায়িকা অনসূয়া সহজেই মনে পড়িয়ে দেয় শকুন্তলা-সখী 'কাব্যে উপেক্ষিতা' অনসূয়াকে; কিন্তু শ্রীঘটক তাকে হাজির করেছেন শকুন্তলা-রূপে, সে একালের শকুন্তলা; আবার, উমা ও সীতার সঙ্গেও তার যোগ রক্ষা করা হয়েছে। নায়কের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তার ভৃগু, স্বভাবতই পুরাণের পরিচিত জবরদস্ত মুনির এবং তাঁর নানাবিধ কার্যকলাপের কথা মনে পড়ে যায়; আসলে সে দুষ্মন্ত। সেকালের ভুলে যাওয়া, একালে ভুল-বোঝা। মঞ্চে যে-নাটকের অভিনয়, জীবনে তারই অভিব্যক্তি। (ওদিকে যেমন দুই বাংলা, গণনাট্য সংঘ স্বাধীন-প্রেমের প্রতীকময়তা, এদিকে তেমনি) অনসূয়া-শকুন্তলা-উমা সীতা, ভৃগু দুষ্মন্ত উপকথাবৃত্তির ওপর উপকথাবৃত্তির আরোপ; সেইসঙ্গে লোক বিবাহগীতি ও মৃত্যুরূপা সংকট-কালী। সব মিলিয়ে 'কোমল-গান্ধার' একটি জটিল ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহুবার-দর্শনেই তার ভেতরকার রস ও রহস্য উপলব্ধি করা যায়, দৃশ্যের উপমাগুলি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে প্রয়োগিক আতিশয্যের গুরুভারও অস্বীকার করা যায় না।

উপকথাবৃত্তির দ্বান্দ্বিকতা সত্ত্বেও 'সুবর্ণরেখা' সরলতর। নামকরণে মনে আসে নদীর উপমা, মরণ-পুনরুজ্জীবন পেরিয়ে-পেরিয়ে অস্তিত্বের গতিশীলতার দ্যোতনা কাহিনি-বিন্যাসের প্রেক্ষাপটে রয়েছে রামসীতা কথা। একদা রামায়ণ কাহিনিও ছিল আদিম উপকথা, 'শস্যরক্ষার জয়গান' বিবাহ-মৃত্যু-পুনর্জন্ম যার ললাটলিখন। তাই রাম সীতাকে পেয়েও হারান, হারিয়ে আবার পান, পেয়ে আবার হারিয়ে ফেলেন—চূড়ান্ত কাল এমনি চলতে থাকে। 'সুবর্ণরেখা'তেও একই ব্যাপার—ওইরকমই পাওয়া আর হারানো,

ঘর বাঁধা ও ঘর ভাঙা, বারবার—স্থান থেকে স্থানান্তরে, মন থেকে মনান্তরে, জীবন থেকে মৃত্যুতে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নবজীবনের, নতুন ঘরবাঁধার আকাঙ্ক্ষায়। অর্থাৎ, রামায়ণের সেই চিরন্তন ট্র্যাজেডি এখানেও, আজও। তবে, হুবহু অনুকরণ নয়। কেন?

বস্তুত, প্রাচীন উপকথাকে যারা হুবহু ব্যবহার করেন, তাঁদের সৃষ্টি 'মাইথোপিয়া' বলে গণ্য হয় না। তাঁরা 'পৌরাণিকতা'-র আশ্রয় নেন। তাঁরা ধার্মিক, কিন্তু আর্টিস্ট নন। শিল্পীর হাতেই উপকথাবৃত্তির সার্থক প্রয়োগ ঘটে; তাঁরা তাকে দেন একালের উপযোগী রূপ, একালের ও সেকালের বাস্তবের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন, দুটো বাস্তবই এক নবতর অর্থে মূল্যবান হয়ে ওঠে। জন্ম হয় তৃতীয় বাস্তবের। ডিজাইন এক, প্যাটার্ন আলাদা—এটিই এর যথার্থ কলারীতি। কারণ, মানুষ যেমন একটি ধারাবাহিক অস্তিত্বের ক্রমিক অভিব্যক্তি, তেমনই পরিপার্শ্বের চাপে সে বদলেও যাচ্ছে বারংবার। অতীতের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে, আবার বিয়োগও ঘটে যাচ্ছে বর্তমানে, উভয়ের দ্বান্দ্বিক ঘাত-প্রতিঘাতে তৈরি হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ। প্রতি স্থানে, প্রতি কালে এটা ঘটছে। উপকথা তাই প্রাচীন; উপকথাবৃত্তি তাই নবীন। এবং উভয়ের সংঘাত সম্মেলনেই শিল্পের সার্থকতা। 'স্পার্টাকাস', 'ইউলিসিস', 'ওয়েস্ট ল্যান্ড', 'হ্যাপি ও অরিঅর্‌স্ ফ্লাই', 'মেঘনাদবধ কাব্য', এসব তো সকলের জানা। চলচ্চিত্রেও 'নাজারিন', 'অর্‌ফি ইলেক্‌ট্রা', 'অ হাজার বেলথাজার', 'প্যাশন অফ জোয়ান অফ আর্ক', 'থিওরেম', 'গস্‌পেল অ্যাকর্ডিং টু-সেন্ট ম্যাথু' ইত্যাদি। ব্রেখ্‌ট-এর 'এপিক থিয়েটার'ও—নামেই প্রকাশ, মহাকাব্য তথা উপকথাবৃত্তির বিস্ময়কর প্রয়োগ। আমি শুধু রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র কথা বলব। কারণ, এটিও রামায়ণ কাহিনিভিত্তিক। অবশ্য, বাল্মীকি নয়, অন্য রামায়ণ, যেখানে রাবণকে বধ করে সীতা উদ্ধার করেন রামকে, নিহত-মৃত রামকে প্রাণদান করেন। সেই সীতাই নাটকে নন্দিনী, রঞ্জনই রাম, এবং রাজাই রাবণ। কিন্তু হুবহু মিলবে না; বৈজ্ঞানিক বিবর্তনতত্ত্ব এবং আদি মৃত্যু-পুনর্জন্ম ভাবনার যোগে নাট্যকার তাঁর কাহিনিকে নতুন অর্থে ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। যেখানে রাজা একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ। 'সুবর্ণরেখা'-তেও ঈশ্বর একই দেহে দশরথ ও রাবণ (এই যোগাযোগের কথা পুরোনো গল্পেও অনেক আছে)। সীতা ও অভিরামের নামস্বারূপ্য তো স্পষ্ট। [একাধিক কাহিনি আছে, যেখানে রাম-সীতা ভাই-বোন, সীতা দশরথের বা রাবণের কন্যা।]

রাম-কথাকে নতুন অর্থাৎ একালীন মানবিক রূপান্তর দেন মধুসূদন, তারপর রবীন্দ্রনাথ; তারপর ঋত্বিক ঘটক। কাব্য-নাটক-চলচ্চিত্র : প্রথমে ব্যক্তির জাগরণ, দ্বিতীয়ে ধনতন্ত্র-বিরোধিতা, তৃতীয়ে এই দুটোই আছে এবং সমাজ-বাস্তবতা। এই ছবিতেই মৃত্যু পুনর্জন্মের তত্ত্ব স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে, বিনোদন-যাত্রা-পথে, সংলাপে—উপনিষদের শ্লোক, রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' এলিয়টের কবিতা-মাধ্যমে। দৃশ্য, মনে পড়ে পিকাসোর 'গুয়েরনিকা' আদিমতার প্রেক্ষিতে আধুনিকতার বিশ্লেষণ, আধুনিক পটে আদিমতার আরোপণ। ফলে, আজকের জীবনে আদিম ভাবনার অস্তিত্ব যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি চিত্র-বক্তব্য পেয়েছে একটি সর্বকালীন ব্যাপ্তি, মুহূর্তে তার ডাইমেনশন বেড়ে গেছে। স্রষ্টা তখন অহংকার করেই বলতে পারেন; "আমার ছবিতে দ্যাখো সমগ্র মানব

সভ্যতাকে।" একদিকে মার্কস ও কডওয়েল, অন্যদিকে ইয়ুং ও নিউম্যান; একদিকে শাসক ও শোষিত, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অন্ধ সংস্কার, মিথ্যা বিশ্বাস, যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে রূপ বদলে বদলে। সে যুগের সেই গৌরী-উমারই সাজ বদলে, মঞ্চসজ্জা বদলে আজকের নীতা, সীতা, অনসূয়া। 'সুবর্ণরেখা'য় বালিকা সীতা হঠাৎ কালীরূপিণী এক বহুরূপীর সামনে পড়ে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। পরিচালকের বক্তব্য : "সমগ্র সভ্যতাই আজ এই ভয়ংকরী কালীর মুখোমুখি—সংকটের, মৃত্যুর মুখোমুখি জীবন, তারই ছবি, তারই চিৎকার।" তুলনীয়, ইনস্টিটিউটের ছবি 'ফীয়ার'। লক্ষণীয়, সীতা এখানে তাবৎ মানব-সমাজের প্রতিনিধি, শরৎচন্দ্রীয় ফর্মুলার 'জনমদুখিনী সতী সীতা' নয়; আধুনিক সীতা সমাজের-শোষণের-সংস্কারের শিকার; পৌরাণিক সীতার আত্মবিসর্জন মিথ্যা কলঙ্কের প্রতিবাদে আজকের সীতার আত্মহত্যা দেহে কলঙ্ক মেখে।

আরও লক্ষ করার বিষয় : ভাঙা এয়ারপোর্টের মতো কোনো একটা ভাঙা মন্দিরে বা পথের ওপরেই পরিত্যক্তা কোনো বীভৎসা কালীমূর্তি দেখানো যেতে পারত, সম্ভাবনার সীমা পেরিয়ে যেত না। কিন্তু, তার আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে বহুরূপীর মাধ্যমে। অর্থাৎ এ কালী সত্য নয়, তার প্রতিমূর্তি বা প্রতিমাও নয়, এ মানুষেরই সেজে আসা। অর্থাৎ, ভয়ের কারণে যে-অবক্ষয়, সে সত্য নয় এসব মানুষেরই সাজানো। সে ভয় দেখায়, আসলে তাকে 'ভয় পাবার' কোনো কারণ নেই, সে অমোঘ নয়। বহুরূপীর উত্তরও এই কথার প্রমাণ। এতদিন মানুষ যা শুনে এসেছে, সেইসব এবং দেবদেবী যেমন মিথ্যা, তেমনি মিথ্যা, এই তথাকথিত সংকট। কতিপয়ের তৈরি করা, মেক-আপ করা, মেড-আপ। বহুরূপীরা মানুষের তৈরি বিগ্রহকে দৃশ্যমান করে তোলার কী অপূর্ব অথচ স্বাভাবিক, সুপরিচিত রূপকল্প।

এবং ঠিক এই কারণেই অবক্ষয়ের পরিচালক পুনর্বাসনেও বিশ্বাসী। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তাঁর 'জীবনেরই জয় ঘোষণা'। যে-তুলনামূলক মিথকে তিনি তুলে এনেছেন আদিম মৃত্যু-পুনর্জন্ম ভাবনার মহাসমুদ্র থেকে, সেখানে দেবতার দুই রূপ : স্রষ্টা ও প্রলয়ংকর, দেবী-মহামাতাও দ্বিরূপ : একরূপে তিনি সুন্দরী মমতাময়ী উমা-গৌরী-অন্নপূর্ণা, আর একরূপে তিনি ভয়ংকরী কালী-চণ্ডী-ছিন্নমস্তা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামরূপে। আজও আধুনিক মানবচিত্তে এই দ্বৈত রূপধ্যান তথা এই ইতি-নেতির ভাবনা, এই প্রতীকী চিন্তা-ভক্তি-বিশ্বাস থাক বা না-ই থাক গভীর প্রোথিত। ধ্যানচিন্তা ভাবনাটি দ্বন্দ্বমূলক, তাই নেহাতই তার শেষ নয়, তার পরেও আছে ইতি। উদ্‌বাস্তুর পুনর্বাসন—নতুন পরিবেশ, নবতর সমাজে। সে পথ, শ্রীঘটকের মতে : প্রেমে (নীতা), আর্টে (অনসূয়া), ব্যক্তির জাগরণে ও প্রতিষ্ঠায় (সীতা)। অনসূয়া সার্থক, নীতা-সীতা ব্যর্থ, মৃত্যুর অধীন। পরিপার্শ্বের পরিবর্তনে যেদিন এরাও পাবে আস, অধিকার, প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা, সেইদিনই কালী হবে উমারূপী, ভয় কেটে জাগবে অভয়, অন্ধকার সরে গিয়ে নামবে সোনালি আলো।

কিন্তু সবার আগে চাই অর্থনীতিক, রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পালাবদল—এ কথা পরিচালক জানেন। ছবিগুলি মিলিয়ে দেখলেই তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়

পাওয়া যাবে। এতদতিরিক্ত কয়েকটি মৌলিকতা ও তাদের ফলশ্রুতি উল্লেখনীয়। প্রথমত—এর কথা আগেই বলেছি—তুলনামূলক মিথকে শ্রীঘটক নানাভাবে ব্যাবহার করেছেন : সাদৃশ্যে, বৈসাদৃশ্যে, একের ওপর আবেকটিকে আরোপ করে। এতদ্বারা যে-জাক্সট্রাপোজিশন তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার মূল ডিজাইন উপকথা-নির্ভর। প্যাটার্ন তাঁর নিজস্ব! পুনশ্চ : প্রতি ছবিতেই এক-এক প্যাটার্ন। একই ফর্মুলার অনাবৃত্তি। 'অযান্ত্রিক'-এ উপকথা ও জীবনকথা পাশাপাশি, তা থেকেই তাদের বৈপরীত্য ও ঐক্য স্বতঃউদ্ভাসিত; 'মেঘে ঢাকা তারা'য় উপকথা নিবিড় হয়ে ছুঁয়েছে জীবনকথাকে; 'কোমল-গান্ধার'-এ দুটোই আছে, বাইরে ও ভেতরে, মঞ্চে ও ঘরে; 'সুবর্ণরেখা'য় জীবনকথাই যেন উপকথা। দ্বিতীয় ভারতীয় উপকথার ব্যবহার। আমাদের দেশে আজকাল 'মাইথোপিয়া'র বিলক্ষণ ব্যাবহার, বেশিরভাগই বিদেশি মিথ : যেমন, 'জাতীয়' নাট্যকার বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এ সীসীফাস। এ শুধু 'জাতীয়' সংস্কৃতিবিষয়ক অজ্ঞতাই নয়, মননের দারিদ্র্যও বটে। অন্যপক্ষে, ভারতীয় লোকসমাজে যে-উপকথা অত্যন্ত প্রচলিত, যেসব দেবদেবী 'প্রাইমডিয়াল ইমেজ' রূপে, যেসব ইমেজ 'আর্কিটাইপ' রূপে সাধারণের চিত্তে গেঁথে আছে সংস্কার, কুসংস্কার, মূঢ় ধর্মবোধ বা গুঢ় মানসকূটরূপে, সেগুলিকেই নির্বিশেষে ব্যাবহার করেছেন শ্রীঘটক। ব্যবহার করেছেন আজকের প্রয়োজনমতো, রূপ ও অর্থ বদলে দিয়েছেন, দরকারমতো ভেঙেছেনও কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্তির নিশানা দিয়েছেন—'জগদ্দল'-এর মৃত্যু যার অন্যতম দৃষ্টান্ত। একদিকে লড়াই বাইরে থেকে, অন্যদিকে লড়াই ভেতর থেকে, তবেই এর রূপান্তরণ সম্পূর্ণ। অর্থাৎ, বিদেশি অনুকরণ নয়, তাঁর জীবন-ভাবনা থেকেই এরা উঠে এসেছে সোজা এবং আধুনিক ভারত-কথার অভিন্ন হয়ে গেছে। উজ্জ্বলশানিত সত্য হয়ে উঠেছে চিত্রপটে প্রতিফলিত বাস্তব।

এবং পারিবারিক ঘটনা-চিত্র, আদিম উপকথার সংস্পর্শে মাইথোপিয়ার অলৌকিকতায়, দেশ-কাল-পাত্র অতিক্রম করে পরিণত হয়েছে বিশ্বভাবনায়, বাস্তবভিত্তিক বহুস্তরবিশিষ্ট জটিল বিন্যাসে, তথা জীবনের মহাকাব্যে। এই উদ্দেশ্যে, শ্রীঘটক আমাদের সমগ্র সংস্কৃতিকে সামনে রেখে, তার ডিজাইনের আধারে, বিশেষ বিশেষ প্যাটার্নের আশ্রয় নিয়েছেন। ওই ডিজাইন এবং এই প্যাটার্ন ধরতে না পারলে তাঁর ছবির চিত্রনাট্য উপলব্ধি ও উপভোগ সম্ভব নয়। এ কথা তিনি নিজেই বহুবার জানিয়েছেন।

পাঠক-শ্রোতা দর্শক তথা জনমানসে 'সামষ্টিক সামাজিক অসংজ্ঞান তত্ত্ব' অবিরত ক্রীড়ারত। কিন্তু এ হল এক জিনিস; তাদের বাইরে নিয়ে এসে বিশ্লেষণ করা অন্য জিনিস; তাদের শিল্পে প্রয়োগ করা এক ব্যাপার, প্রযুক্ত শিল্পে তাদের স্বাদগ্রহণ অন্য ব্যাপার। বলাবাহুল্য, আমাদের দর্শকসমাজ এ-বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ শিক্ষিত নন। তাই, বারবার দেখেও 'রক্তকরবী'র বক্তব্য বুঝতে পেরেছেন ক-জন প্রেক্ষক?

উপসংহার

'নাগরিক'-এর দৃশ্যসূচনা হয়েছিল গঙ্গার তীরে। 'অযান্ত্রিক'-এ পাহাড়তলি। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় পাহাড়। 'কোমল-গান্ধার'-এ গঙ্গা-পদ্মা। উপকথাভিত্তিক জীবন মহাকাব্য বিকশিত হতে হতে একটি বিশেষ বৃত্তে পরিণত 'সুবর্ণরেখা'য়। এর পরে, এর পরেই তো তিতাস, 'তিতাস একটি নদীর নাম'। অনিবার্যভাবেই। নিতান্তই সৌজন্যের খাতিরে নয়, অন্তরের ভেতর থেকেই উচ্চারিত হয়েছে, সেই অমোঘ বাক্য তিনটি : "আমি ছাড়া 'তিতাস' সৃষ্টি হত না। 'তিতাস' ছিল আমার স্বপ্ন। আমার মমতা নিয়ে এ কাহিনীকে কেউ তুলে ধরতে আগ্রহী হতেন না।" (চিত্রালী ২০ শ্রাবণ ১৩৮০ ঢাকা)।

এতদিন শ্রীঘটক যেসব কাহিনি নিয়ে ছবি করেছেন, মূলত তাদের কোনোটাই মহাকাব্য-উপমা নয়! তথ্যের তুলনায় তত্ত্ব ভারী, গল্পের চেয়ে দর্শন। কিন্তু অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস আকারেই মহাকাব্য। একটা গোটা জাত এর বিষয়। বিশাল পটভূমিকা। চলমান জীবনই এর নায়ক। একদা উৎপল দত্ত গ্রিক মহানাট্যের আদলে ও ব্রেখ্‌টীয় রীতিতে একে উপস্থিত করেছিলেন, মঞ্চকে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে প্রসারিত করে দিয়ে, এবং স্যানিস্যলভ্‌সকীয় ছন্দ যোজনা করে। জানি না, বাংলাদেশে তোলা শ্রীঘটকের ছবিতে. এ কাহিনি কী রূপ পেয়েছে, আদৌ চিত্র মহাকাব্য হয়ে উঠেছে কি না। তবে, তাঁর কাহিনি নির্বাচন যে তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্বের অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শন, এ কথা উচ্চকণ্ঠেই বলা চলে। গঙ্গার পর সুবর্ণরেখার পরেই তো তিতাস। ক্রমাগত উত্তরণ সমুখপানে। শেষ দুই নদীর মাঝের ছবি 'দুর্বার গতি পদ্মা' এবং 'ইয়ে কিঁউ' এদের জন্ম সৃষ্টির তাগিদে নয়, বাঁচবার তাগাদায়। তা ছাড়া, সুস্থিতিও তখন ছিল না। বস্তুত, এটিই, এই অস্থিরতাই ঋত্বিক ঘটকের ক্রটি—শিল্প রচনার জন্যে প্রয়োজনীয় সংযম ও সংহতির অভাব, একান্ততার মধ্যেও যে দূরত্ব প্রয়োজন, তার অনুপস্থিতি। বিরাট ক্যানভাস, গভীর বক্তব্য, প্রচুর উপকরণ, সবই আছে তাঁর ছবিতে, নেই যা, তা হল শৃঙ্খলা-বিন্যাস-পারিপাট্য। [শুনেছি : 'তিতাস'-এর ললাটেও এই ক্ষতচিহ্ন!]

আবার এও সত্য : তা যদি থাকত, তাহলে ঋত্বিক ঘটক 'ঋত্বিক' হতে পারতেন না। সমকালে সর্বকালের স্পর্শ; স্বদেশানুগ ও বিশ্বানুগ জীবনদর্শন। একাধিক স্তরবিশিষ্ট আর্ট চর্চা, সব ছড়ানো ছিটানো অগোছালো এলোমেলো; বা অকারণে জটিলতর। দুটো মিলিয়েই ঋত্বিক ঘটক : একক ও অনন্য, ভারতীয় চলচ্চিত্রের একমেব আফাঁ তেরিব্‌ল, টেরিব্‌ল ইন্‌ফ্যান্ট, দুরন্ত শিশু।

প্রতীতি দেবী

ঋত্বিক ও আমি : আমাদের ছেলেবেলা

খুব ছোটোবেলায় যতটুকু মনে আছে এবং আজ এতদিন পরে স্মৃতিও তো সব ধরে রাখতে পেরেছে কি? অনেক বিস্মৃতও বটে। এ অবস্থায় আমার-ই হাতে লেখা কী হবে জানি না, তার মূল্যায়ন বা কতটুকু হবে ভেবে শঙ্কিতচিত্তে কিছুটা চেষ্টা করছি সভয়ে, পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে।

ঋত্বিক, আমার এবং আমাদের সমগ্র পরিবারটিই একটি সেলুলয়েডের ছবির মতনই।

বাবা যখন যশোরে কর্মরত, আমাদের বয়স তখন দুই-আড়াই হবে। অত ছোটোদের একটা ছায়া ছায়া আবছা সামান্য যা কিছু মনে হয় বোধহয় যার অনেকটাই স্বপ্নের মতো। সে থেকেই শুরু করতে চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর (উচ্চ রাজকর্মচারী) উৎসাহে শিলাইদহের কুঠিবাড়ি যাত্রা করলাম। নিভৃত মনেতে আশা যশোরে নব্বই বিঘের ওপর ক্লাইভের আমলের বহু বিচিত্র গল্পের নায়িকা সে বাড়িটি দেখে আসব। ছোট্ট এক টুকরো কাগজে লিখে নিলাম আবছা স্মৃতির টুকরো টুকরো অংশ, দেখে মিলিয়ে নেবার জন্য। খুবই কম, তবু যা ভেবেছিলাম প্রায় মিলে গেল। বাকি সব বাড়িতে শোনা গল্পের সঙ্গে মেলালাম। দোতলায় ওঠার মস্ত কাঠের সিঁড়ির নীচের অন্ধকার সেই কুঠুরি যাকে গুমঘর বলা হত নীচ থেকে নাকি কান্নার শব্দ শোনা যেত। মিলে গেল। যে-বারান্দায় কাঠের ঘোড়ায় চড়ে রেস দিতাম তাও মনে হল চিনলাম। পরে যে-মাঠে বাবার সঙ্গে সত্যি ঘোড়া চড়া শেখার জায়গা সেটা ভালোই চিনলাম। তিনটে পুকুর ছিল, যেখানে মা নিয়মিত মাছ ধরতেন। ছোট্ট আমরা সেগুলোকেই নদী বলতাম। আসল নদীতে তো বোটে যাওয়া হত কিন্তু মনে নেই ভালো করে।

বাবা বদলির পরপরই বাইশ দিনের ট্যুরে মফস্‌সল চলে গেলেন। কুড়ি-বাইশটা লণ্ঠন ও হ্যাজাক নিয়ে আমাদের ভাইবোনদের নিয়ে মা রইলেন। ভূতের বাড়ি বলে স্থানীয় কোনো কর্মচারী বা পাহারাদার সন্ধের পরে থাকে না। পুলিশ বাধ্য হয়ে থাকত শুনেছি, কিন্তু গার্ডের ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকত।

অসমসাহসী মা সারারাত বই পড়ে আর রাতভর ঘুরে ঘুরে কিছুই দেখতে পাননি। সাহসীদের ভূতেরাও বোধহয় ভয় পায়। এদিকে দিনের বেলা পুলিশরা আমাদের গলা

কাটা সায়েবদের গল্প বলত। মা শুনে তাদের পাহারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যেসব কাজের লোক পরিবারের সঙ্গে গিয়েছিল শুধু তারাই থাকল।

মা না দেখলেও অন্যেরা নাকি কাউকে কাউকে দেখেছিল। মাঝখানের খুব বড়ো ঘরে আমাদের শোবার ব্যবস্থা, সে ঘরে অন্য দু-ভাইবোনও থাকতেন তাঁদের আলাদা খাটে। ঘুমোনোর সময় ভারি মিষ্টি গলায় কে গান গাইত সে কি মা না অন্য দিদিরা মনে নেই, তবে গানটা মনে আছে। 'আমার অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা।' (বড়ো হয়ে মা-র কাছে জীবনের প্রথম শেখা আমার এই গানটি)।

সবাই বলত ঘুমপাড়ানো একটি সুন্দর মেয়ে নাকি গাইত। ঋত্বিক ও আমি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। প্রথম জ্ঞাত হয়েই ভূতেদের সান্নিধ্যে এক বিরল জীবনারম্ভ। পরে তো নিজেরাই ভূত হয়ে গেলাম। যতদিন দুজন একসঙ্গে ছিলাম মাথার কাছে বই এবং গান না-শুনে ঘুমোতে পারতাম না। আমি পরে অনেকদিন সে অভ্যেস ছাড়তে পারিনি কিন্তু ঋত্বিক পরে কি গান শুনতে পেত? ওর বাড়িতে তো তখন সুর ছিল না বলেই জানি। অনেক পরে কলকাতায় দেখেছিলাম গান শুনতে তবে বাড়ির কারোরই নয়। রেকর্ডে নামকরা গাইয়েদের গান। আমিও অবশ্য কুমিল্লায় গভীর রাতে রেকর্ড প্লেয়ারে তাই শুনতাম।

ভূতরা যে কত ভালো বন্ধু হয় আমি জানি কিন্তু ঋত্বিক ভারি ভীতু ছিল তাই ওরা ওর বন্ধু হয়নি। একটু বড়ো হয়ে মাকে জড়িয়ে ছাড়া শুতে পারত না। ভূতেদের গল্প শোনার আমার অত্যন্ত উৎসাহ তাই বাবা, 'ইউনিভার্সাল ঘোস্ট স্টোরি' থেকে আমাদের শোনাতেন। ঋত্বিক কানে আঙুল দিয়ে মাকে জড়িয়ে বসে আমাকে আস্তে আস্তে ভীষণ বকত। আমার জন্যই তার এ শাস্তি। সেসব গল্পের খুব বিখ্যাত একটি (সত্যি ঘটনা) গল্প আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে। সে গল্প ভীতুদের জন্য নয় তাই আলাদা হলদে কাগজ জড়ানো ছিল। বড়ো হয়ে ঋত্বিকের যখন ভয় একটু কমল আমার কাছে অনেকবার এ গল্প সে শুনেছে। এগুলো একটু বড়ো হবার পরে।

আগেই বলেছি, কিছু আগে-পরে হতে পারে স্মৃতির ধারাবাহিকতা বিঘ্নের জন্য।

এরপরে ময়মনসিংহ। যেখানে আমাদের চার বছর থেকে সাত পর্যন্ত যা মনে আছে লিখতে চেষ্টা করছি। এখানকার স্মৃতি বেশ ভালো মনে আছে কম হলেও।

ব্রহ্মপুত্র নদীর পরে মস্ত মাঠ, তারপরে বাগানঘেরা ভারি সুন্দর বাড়ি। অনেক সুখ-স্মৃতি আজ স্বপ্নের মতো দুঃখ-সুখের পাখিদের গান হয়ে আমার হৃদয়তন্ত্রে এক গভীর অনুভূতি জাগায়।

এখানেই পাঁচ বছর বয়সে আমাদের আনুষ্ঠানিক হাতেখড়ি। সে বৃহৎ অনুষ্ঠানের অনেক গল্প শুনেছি কিন্তু সবকিছু খুব পরিষ্কার মনে করতে পারি না। তবে পেটুক ঋত্বিক পুরোহিতের খাবার থালা থেকে রসগোল্লা ছোঁ মেরে নিয়ে খেয়ে ফেলা ছাড়া, যে-কোনো খাবার আমার ভাগেরটাও খেয়ে ফেলত। আমারও খাবারদাবারের প্রতি অনুরাগ কম তাই তাতে আমি অখুশি হতাম না।

শুনেছি পরবর্তী জীবনে খেতে দেয়া হত না বা পেত না—আমার মা-বাবার সৌভাগ্য, সে দৃশ্য দেখতে হয়নি।

এরপরে আমাদের মিশনারি স্কুলে ভরতি হবার পালা। এই প্রচণ্ড দুরন্ত দুটিকে নিয়ে মা গেলেন স্কুলের পথে। খুব বেশি দূরত্ব বোধহয় ছিল না মনে হয় এখন। গাড়ির ভেতরেই দুজনকে নিয়ে মা-র উদ্‌বিগ্ন মুখ আবছা মনে আছে। মা হয়তো ভাবছেন এদের কি সত্যিই স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মে রাখা যাবে? কী অঘটন ঘটিয়ে বসবে, নানা চিন্তা। যথাসময়ে গেটে প্রিন্সিপাল, ইংরেজ মহিলা মিস হগবেন সাদরে তাঁর আপিসঘরে নিয়ে বসালেন। মা প্রথম থেকেই আমাদের সবরকম গুণকীর্তন বর্ণনা করছেন, তখন আমরা দুজন মিস হগ্‌বেনের গোল টেবিলের নীচে ঢুকে খুবই অশোভন খেলা অর্থাৎ তাঁর জুতো মোজায় ABCD লিখে চলেছি। সবিনয়ে মা বললেন, এদের কি তিনি সামলাতে পারবেন? হেসে তিনি বললেন, "সে ভার তো আমার মিসেস ঘটক। আমরা শিক্ষাব্রতী, শিশুকে মানুষ করাই আমাদের ব্রত এবং প্রধান ধর্ম। সে স্নিগ্ধ সৌম্য ইংরেজ মহিলাকে আজও ভুলতে পারিনি অনেক কিছু ভুলে গেলেও। ওইরকম ডানপিটে ছেলেমেয়ে নিয়ে মা এবং বাড়ির সকলের যে-দুশ্চিন্তা ছিল (বাবা ছাড়া) কিছুদিনের মধ্যে তা নিরসন হয়েছিল শুনেছি। তিনি আমাদের প্রতিদিনের সহচরী ছিলেন কিছুদিন। রাত্রে শোবার সময় আদর করে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প-কথা বলতেন। শেষ কথাটি ছিল "Whatever you do, do with your mind" আজও প্রতি রাতে তাঁকে স্মরণ করে কথাটি মনে করি। যা করি মন দিয়েই করি, যা করি না তা কখনোই করি না। কোনো আপস, মীমাংসা সেখানে নেই। ঋত্বিক তার জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছে। যা সে করে বা বিশ্বাস করে তা যে-কোনো মূল্যেই করেছে। যা সে করে না, কোনো অবস্থাতেই তা সে করেনি। আমার চেয়ে অনেক বড়ো লেখকরা তার মূল্যায়ন করে গেছেন এবং করছেন। সে তার সেলুলয়েডের ফিতেয়ই তো সব গেঁথে দিয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর থেকে কিছুমাত্র শিক্ষা বা ভাবমূর্তি যদি নিতে পারেন, ওর নিরলস ক্রিয়াকাণ্ডের সার্থকতা সেদিনের জন্যই তোলা রইল। যে এত ভোজনবিলাসী ছিল, নিদারুণ খাদ্যাভাবও তাকে কর্মবিমুখ করতে পারেনি। দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে গেছে এত বড়ো দেশ ও দেশের সম্পদ, ক্ষণজন্মা ঋষি ঋত্বিক ঘটক।

আমাদের বাড়ির সবচেয়ে বড়ো অনুষ্ঠান বাবা-মায়ের বিবাহবার্ষিকী। কত রকমারি সাজে সকলে সাজত, বাড়িতে লেখা নাটক হত, কত নাচগানের অনুষ্ঠান যে হত, কত মানুষের আনাগোনা, খাওয়াদাওয়া—সে এক উৎসবমুখর দিন হত। একবার ঋত্বিক—রাম, আমি—লক্ষণ, দিদির মেয়ে টুসকি সীতা হয়েছিল। কী যে সুন্দর অনুষ্ঠান, আমার ভালোভাবেই মনে আছে। সেদিনের বাবা-মায়ের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ ঋত্বিক-প্রতীতির ছবি এখনও আছে। রাম কিন্তু অনেকের খাবার খেয়ে ফেলেছিল মেহেদী গাছের আড়ালে গিয়ে, আমাকে পাহারা রেখে।

ব্রহ্মপুত্র নদীতে দাদা-দিদিরা সাঁতার কাটতে যেতেন। কখনও বাবা-মাও যেতেন। সে জায়গাটা খুব মনে আছে। ওঁরা যে রেলিং-এর ওপর থেকে ঝাঁপ দিতেন, মাছের চেয়েও সুন্দর করে সাঁতরিয়ে চরের থেকে তরমুজ পিঠে নিয়ে ফিরে আসতেন তাই দেখে আমাদের যে কী ভীষণ ইচ্ছে হত ওঁদের মতো সাঁতার কাটতে। কী বলব বিধি বাম—ওই মিস হগবেন বেল্ট বাঁধা চেয়ারে দুজনকে বসিয়ে শুধু দেখতে দিতেন। বলতেন একটু

বড়ো হলেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হবে। পদ্মার মতো ঘূর্ণি না থাকায় ব্রহ্মপুত্রে অত ভয় ছিল না। কিছুদিন পরে লাইফ বেল্টের সঙ্গে দুজনকে বেঁধে একদিন শুধু নামানো হয়েছিল।

ব্রহ্মপুত্র নদী আমাদের সকলের খুব ভালো লাগত। দাদা-দিদিদের সাঁতারের জন্য বাবা সুন্দর কাঁচা কটেজ করিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আমাদের দুঃখের কথা আর কী বলব, চার-পাঁচজন লোক ও ভাইবোনদের সঙ্গে ছাড়া আমাদের ওমুখো যাবার হুকুম ছিল না।

এরপরে সুসং-এ যাবার কথা বেশ মনে আছে। বাবার নিজের কাজ ও আত্মীয়দের নিমন্ত্রণে পরিবারের সুসং যাত্রা। তাঁরাই বোধহয় হাতি ও অপূর্ব সুন্দর পালকি পাঠিয়েছিলেন। মা পালকিতে, বাবার হাতিতে আমরা দুজন, অন্যেরা অন্য হাতিতে মরা নদীর ওপর দিয়ে সুসং চললাম। কী সুন্দর সে নদীপথ। নদী পার হতেই কমলালেবুর গাছ। আমাদের ছোটো ছোটো হাতে কত যে কমলালেবু ছিঁড়ে হাতিকে খাওয়ালাম আনন্দে আত্মহারা হয়ে; কী বলব কী যে আনন্দ। সে অপরূপ দৃশ্য খুব পরিষ্কার মনে আছে কিন্তু সুসং রাজবাড়ির স্মৃতি খুব কম। আমাদের বাড়িতেই তাঁদের অনেকবার দেখেছি।

এক সময় শ্রী মণি সিংহ ঢাকায় কোনো এক বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন। ঘটনাচক্রে সেই বাড়িতেই আমি কুমিল্লা থেকে এসে উঠলাম। আমার নাম শুনে আমাকে ডেকে অবাক হয়ে আদর করে বলেছিলেন, "এ নামতো মনে রাখার মতো, তুমিই সেই ছোট্ট প্রতীতি।"

সে আমলে প্রবাদবাক্য ছিল, একশো বছরে একবার টর্নেডো হয়। আমরা ময়মনসিংহ থাকাকালীন সেই ভয়াবহ টর্নেডো সমস্ত জেলা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। বিকেল চারটের দিকে নদীর ধারে আমাদের খেলতে নিয়ে যেত দুজন, কারণ একজন আমাদের সামলাতে পারত না। হঠাৎ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গেল সারা আকাশ, সঙ্গে ঝড় শুরু হয়ে গেছে। আমাদের কোলে উঠিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হতে চেষ্টা করছে, এমন সময় দেখি নদীর মাঝখান থেকে লম্বা হাতির শুঁড়ের মতো গোল কী ভীষণ একটা কিছু আকাশে গিয়ে ছুঁয়েছে। এরপরই প্রচণ্ড ঝড় আমাদের কিছুতেই ফিরতে পারছে না। বাবা তাড়াতাড়ি আপিস থেকে ফিরেই সব লোকজন নিয়ে এলেন অতি কষ্ট করে। একটা ছোটো ঘর ছিল, সে ঘরে সকলকে ঢুকিয়ে (কাজের সব লোকদেরও) চুপ করে বসে থাকতে বলা হল। সে অবস্থায় ঋত্বিক বলল, "চল চোরপুলিশ খেলি।" আমাদের ওপরের ছোড়দা তখন বারো তেরো বছরের ছেলে, খুব ধীর স্থির শান্ত ছিল। সে হারমোনিয়ামের বাক্স এনে বোর্ড বানিয়ে স্কুল স্কুল খেলতে লাগল কিন্তু ঋত্বিক ও আমি সে খেলা খেলতে চাই না। একটু ঝড়ের তাণ্ডব কমলে বাবা-মা'র খাটে মশারি টাঙিয়ে জাহাজ তৈরি করে বাড়িতে যত ভালো খাবার ও পানীয় ছিল খাওয়াতে ঋত্বিক বশ মেনে গেল। সেই ভাই সাসু ঘটক পরবর্তী জীবনে নেভাল কমোডর ছিলেন কিন্তু আসলে তিনি খুব ভালো ছবি আঁকতেন, লেখায়ও পারদর্শী। বম্বের থেকে নিজের কাগজ 'ওশেনাইট' এডিট করতেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় অতি শিশুবেলা থেকে ঋত্বিক ছবি আঁকা ও ছবি তৈরির অনুপ্রেরণা পেয়েছিল।

এদিকে জেলা অধিকর্তা হিসেবে বাবাকে তক্ষুনি জেলা, মহকুমা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে হল আর মা তাঁবু খাটিয়ে অনেকগুলো টেম্পোরারি হাসপাতাল বানিয়ে তাঁদের সেবায় নিযুক্ত হয়ে গেলেন। তারও হালকা ছবি কিছু মনে আছে।

এ অবস্থায় এই দুই দুরন্ত শিশুদের নিয়ে ভাইবোনদের কী অবস্থা হয়েছিল তাঁদের কাছে গল্প শুনেছি। কিন্তু ত্রাণনেত্রী ওই মিস হগবেন। তখনই তিনি আমাদের দায়িত্বে এলেন। আমাদের Rit ও Prit বলে ডাকতেন। সে কণ্ঠ স্বপ্নের ঘোরে এখনও কখনো-কখনো বেজে ওঠে। কখনও কানে। কখনও প্রাণে। চমকে যাই আজ এত বছর পরেও তিনি আমাদের ছেড়ে যাননি। ঋত্বিক তো তাঁরই কাছে, আমি কেন এত দূরে?

তাঁর ভবিষ্যৎবাণী সফল করেছে ঋত্বিককে—আমাকে করেছে মানসিক শক্তির অধিকারী। প্রণাম তোমায়, শত শত কোটি প্রণাম তোমার পায়ে, বুকে, মুখে।

এত যে দুরন্তপনায় জ্বালিয়েছি তবু তো কখনও একটি জোরে কথাও শুনিনি কারোর কাছে। এমনকি যাঁরা কাজের লোক ছিলেন তাঁদেরও কী অকৃত্রিম স্নেহ পেয়েছি। সবাই তাঁরা প্রণম্য আমাদের কাছে।

এরপরে কলকাতায়। সেসব কথা এ স্বল্প পরিসরে লেখা হয় তো যা[illegible] না। অল্প লিখে এ লেখা শেষ করা সমীচীন বোধ করছি।

দুজনে প্রথমে একই মিশনারি স্কুল, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে [illegible] পারার কারণে। পরে ও বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে ভরতি হল। (রোজই আমাদের নিয়ে গাড়ি ওর স্কুল থেকে উঠিয়ে নিয়ে ফেরা। কিন্তু ঋ[illegible]কর, স্কুলে গেলেই ড্রাইভার শিউনন্দনকে ছোলা ভাজা খেতে দিয়ে আমাকে থামিয়ে [illegible]বল, ক্রিকেট বা অন্য কিছু খেলে বাড়ি ফেরা। এত দেরি হয় দেখে বাবা ভাবলেন শিউনন্দন নিশ্চয় [illegible]শওয়ালী ভাইদের সঙ্গে গল্প করে আমাদের আনতে দেরি করে! মা শুনে বললেন, কনিষ্ঠদের যদি এখনও চিনে না থাকো তবে তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। বাবাকে নিয়ে মা নিজেই একদিন আমাদের আনতে গিয়ে দেখালেন কনিষ্ঠদের যুগল বাঁদরামো। ওঁদের দেখেই দুজন দুজনের কোলে বসে আনন্দে চৌরঙ্গি[illegible] ফিরপো থেকে চকো[illegible]লেট ও কেক খেয়ে ও নিয়ে বাড়ি ফেরা। অন্য ভাইবোনদেরও লোভ হল তাতে, তারাও মহাখুশি। সেই সময়ই বিকেলে খেলতে গিয়ে পার্কে স্লিপ খেয়ে পড়ে আমার হাত ভাঙল। সেই হাতে আজও ধনন্তরী ডাক্তার স্বর্গী[illegible] বিধানচন্দ্র রায়ের হাতের স্বর্ণাক্ষর বহন করছি। হাত ভেঙে যেন স্বর্গ উদ্ধার করেছি [illegible] হল। যেমন প্রচুর জিনিস তেমনি খাওয়াদাওয়া। সেইসব জিনিস দিয়ে বাড়িতেই একজিবিশন হল। তাতেও আমি পুরস্কৃত হলাম। এই শোকে ঋত্বিক অস্থির হয়ে গেল, কেন ওরও হাত ভাঙছে না। ভীষণভাবে প্যারালাল বার ইত্যাদিতে লাফালাফি করে অবশেষে ওরও এক হাত ভাঙল কিন্তু ওর বেলায় পুরস্কার কিছু কমতি হওয়ায় আমার সব জিনিস ওর বলে দাবি জানিয়ে নিজের বলে ঘোষণা করল। বয়স সাড়ে ৭ বছর। সব জিনি[illegible] নিজের নাম লিখে আঠা দিয়ে সেঁটে দিল। কারণ দেখাল সে ছাড়া আমার দাবিদা[illegible] কেউ নেই। ওর একবারই ভেঙেছে আমার কিন্তু তারপরেও হাত চারবার, পা চারবার ভেঙেছে। সব কিছুতেই ওরই বেশি কষ্ট হয়েছে। যেমন কান্না তেমনি ভালোবাসা।

সেজদা, ছোড়দা বাবার দেয়া চকচকে টাকা সব আমার হাত বুলিয়ে দুটো চকোলেট দিয়ে নিয়ে যেত সিগ্রেট খাবার জন্য। ভীষণ মনঃকষ্ট ঋত্বিকের। বাবা বার্মা চুরুট খেতেন। একদিন আমাকে বলল, "ওরা সিগ্রেট খাকগে, তুমি বাবার ওখান থেকে চুরুট নিয়ে এসো, ওদের দেখিয়ে আমিও খাব।" বয়স ১০ বছর। আনলাম চুরুট কিন্তু হা হতোস্মি—দাদারা সেখানেও দাদাগিরি ফলিয়ে চুরুট খেতে লাগল। বোধহয় এসব অতীতের মনোদুঃখেই শেষ জীবনে বিড়ি ধরেছিল। হয়তো ভেবেছিল এ জিনিসে আর কেউ ভাগ বসাবে না। বসায়ওনি। ভালো কিছু তো অন্যেরা নিয়ে গেছে। এদিকে দাদারা মাকে ভীষণভাবে বুঝিয়ে বলল, 'কুকুরের স্টিম্যুলেন্ট প্রয়োজন নইলে রাত জাগা সম্ভব নয়।' তাদের জন্য গোল্ড ফ্লেক, ক্যামেল, ক্রাভেন-এ লাকিস্ট্রাইক জাতীয় ভালো ভালো সিগ্রেট আসতে লাগল। খুব সংগত কারণেই সেসব কুকুরের চেয়ে মনিবপুত্রদের কাজেই বেশি লাগল তবে প্রচণ্ড নেশা করিয়েছিল ওই দুই কুকুরকে। শেষের দিকে দাদারা বাড়িতে না থাকলে তারা সোজা মা-র কাছে চলে যেত। পশু অনেক আবেগপ্রবণ ও অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের চেয়ে, আজ জীবনসায়াহ্নে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেই এ কথা বলছি।

এরপরের অনেক কাহিনি, সে কথা পরে আসবে আশা রাখি এবং যদি লিখতে পারি শেষ পর্যন্ত। অবিচ্ছিন্ন দুটি প্রাণের দোসর কেউ হতে পারল না আমাদের জীবনে, প্রমাণিত সত্য এটি। দূরদেশি ওই রাখাল ছেলেটি আমার বাটের বটের ছায়ায় সারাবেলা খেলে সন্ধেয় কোথায় ফিরে গেল আর খুঁজে পেলাম না। আমাদের জীবনেতিহাস একটি সফল সেলুলয়েডের ফিতে।

আমি একা বয়ে চলেছি এ মর্মবেদনার ছোট্ট একটা সাদা পালতোলা ডিঙি—অনেক নদী পেরিয়ে ঢেউ-এর পর ঢেউয়ে ভেসে ভেসে কোথায় গিয়ে ঠেকবে জানি না। হয়তো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে নয়তো সেই যে মস্তবড়ো নদীটা, যার ওপারে দেখা যায় না শুধু ভাবা যায় দিক্‌চক্রবাল রেখার ওপারে কী আছে, তাতো আমি প্রতীতি জানি না—জানে ঋত্বিক।

মহাশ্বেতা দেবী

ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর প্রবন্ধ

'চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু' বইখানি* ঋত্বিক ঘটকের পনেরোটি লেখার সংকলন। লেখাগুলির বিষয়বস্তু গ্রন্থের নামকরণেই প্রকাশিত। এটি ঋত্বিক ঘটকের সংকলিত রচনাবলির প্রথম খণ্ড। এতে তাঁর 'যুক্তি তক্কো ও গপ্পো' এবং 'তিতাস একটি নদীর নাম' বিষয়ক কোনো লেখা নেই, কেন-না, সব লেখায় দিনাঙ্ক না থাকলেও সম্ভবত ১৯৭২-এর পরের কোনো লেখা এতে সংকলিত হয়নি। সেজন্য পরবর্তী খণ্ডের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

এই বইটির জন্য প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদ পাবেন, কারণ ঋত্বিক ঘটক নিজে। তাঁর লেখাতে তিনি বারবার দুটি প্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন। একটি myth। অপরটি হল, প্রত্যেক সৎ শিল্পসৃষ্টিই বিভিন্ন পর্যায়ে স্তরিত। সৃষ্টির সার্থকতা সেখানে এবং চেতনানুভূতির স্তর একই শিল্প থেকে পাওয়া সম্ভব বলে দর্শক-পাঠক বা শ্রোতার পক্ষে সে শিল্পে অধিগমন ফলদায়ী। এক কথায় বলতে পারি myth এবং manylevelled existence-এর কথা তিনি স্ব-বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন। ব্যাপার হল, এই বইয়ের জন্য প্রকাশক ধন্যবাদার্হ, আবার বলি, কারণ ঋত্বিক স্বয়ং। কেন-না জীবিতকালেই তিনি তাঁর অনভিপ্রেত এক myth হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তার কারণ, বহুপলযুক্ত হীরক বা পৃথিবীর পেটের মতো তিনি একই সঙ্গে মহানন্দে; বা ভীষণ, শুভ্র ও নিরঞ্জন বস্তুনিরপেক্ষ স্বার্থশূন্য ক্রোধে; অথবা শিশুর মতো হেসে; অথবা যা তাঁকে ব্যথিত করে তাকেই গালাগালি করে; অথবা শুধুই পানের আনন্দে বিভোর থেকে; অথবা প্রচণ্ড আবেগে সকলকে ভালোবেসে—বহু স্তরে প্রবল প্রাণময়তায় exist করতেন। এরকম মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত আরও আরও myth-এর বিষয়বস্তু হবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এবং তাঁকে অত্যন্ত ভালোবেসে শ্রদ্ধা করেই আমরা আমাদের প্রিয় আরেক জাতীয় চরিত্রশালায় বসাব তাও বিস্ময়োদ্রেককারী কিছু নয়। এতাবৎ এ চরিত্রশালায় আমরা তিনজন সত্যি মানুষ আর

*চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু : শ্রীঋত্বিককুমার ঘটক। 'সন্ধান' সমবায় প্রকাশনী, ২০১-এ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, কলকাতা-৭। প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৮২। দাম ৬.০০ টাকা।

একটি উপন্যাসের চরিত্রকে পেয়েছি ও জাতীয় মানসে লালন করছি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শিশিরকুমার ভাদুড়ি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের তিনজনকে কোথাও আমরা দেবদাসের চশমায় দেখে থাকি এবং কয়েকটি equation draw করে স্বস্তি পাই। যদিও মাইকেলের পত্রাবলি ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি myth বর্জন করে আলোচ্য ব্যক্তিদ্বয়ের ঋজু ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতাকে প্রতিভাত করে। আমাদের প্রিয় জাতীয় equationগুলি আর উল্লেখ করলাম না। ঋত্বিক ঘটককে ভালোবেসে ও শ্রদ্ধা করেই এই প্যানেলে আনা হতে পারে। সম্ভাবনা বর্ষার ঘাসের মতোই প্রবর্ধমান এবং আজ ঋত্বিক ঘটক সশরীরে সকল কথা তাঁর নিজস্ব বিশেষণবহুল ভাষায় থামিয়ে দিতে হাজির নেই। কিন্তু তাঁর স্বরচিত লেখা যতই বেরোয়, ততই ভালো। কেন-না ঋত্বিক ঘটকের লেখা, জন কিট্‌সের পত্রাবলির মতোই নিজের সম্পর্কে বহু কথা খারিজ করে এবং এমন এক ব্যক্তিমানসকে হাজির করে, যার চিন্তাগুলি আমাদের শৈল্পিক সত্তাকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে অতীব প্রয়োজনীয়, কেন-না নৈরাজ্য আজ চূড়ান্তে। বস্তুত, ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুর পর থেকেই আমার ভয় ছিল। সমাজ ও জীবন কর্তৃক দুর্ব্যবহৃত এক বঞ্চিত হতভাগ্য, যে প্রচণ্ড অভিমানে অবশেষে কাচের গেলাসে মুক্তি ও মৃত্যু খোঁজে, তেমন এক মানসলালিত ব্যক্তিত্বের বিষয়ে আমাদের জাতীয় চরিত্রে প্রভূত দুর্বলতা ও মমতা আছে। কোনো কোনো মানুষ, তাঁরা আসলে কীরকম, কেন এবং কোন্ কোন্ কারণে তাঁদের বহিরঙ্গ-ব্যাবহার ও আচরণ পরিণামে বিনাশকারী হয়, তা বুঝতে গেলে মানসিক দায়িত্ব স্বীকার করতে হয়। এবং মনকে পরিশ্রম করাতে যেহেতু আমরা বড়োই নারাজ, সেহেতু আমরা ভেতরে প্রবেশ করে মানুষটি নিজেকে যেভাবে বোধ্য করতে চান তা করি না এবং একটি অভ্যস্ত প্যাটার্নে তাঁকে বসিয়ে সমীকরণ করে ফেলি। এও আরেক ধরনের deification আর কী। জীবন্ত মানুষের চেয়ে মূর্তি অনেক নিরাপদ। কেন-না মূর্তি যেমন তৈরি করা যায় তেমনি থেকে যায় বিশ্বস্তভাবে, এবং সে যেমন হলে আমাদের ভালো লাগে, সেই লালিত contour ভেঙে নিজের মতো হয়ে সকলের অস্বস্তি ঘটায় না। ঋত্বিক ঘটক প্রসঙ্গে হাজারটি ধারণা সৃষ্টি করার কারণ তিনি নিজেই [illegible] ঘটিয়ে গেছেন। যেগুলি মিথ্যাও নয়। নিশ্চয়ই সত্য সেই সবই। সেই অস্থিরতা, উদ্দাম প্রাণপ্রাচুর্যে নানারকম আচরণ, সেইসব কথাবার্তা। কিন্তু সেগুলি শেষ অবধি ঋত্বিক ঘটক নয়। আসল ঋত্বিক ঘটক খুবই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ স্ববিশ্বাসের কাছে, চিন্তিত তাঁর শিল্পমাধ্যমের বহু সমস্যা নিয়ে, সর্বদা নিরাপত্তা না-খুঁজে চিত্রনির্মাতা ও দর্শক যাতে সৎ ও বয়স্কমন্য হন সেই কামনায়, এবং তাঁর প্রত্যেকটি লেখায় দেখা যাবে আশ্চর্য শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতায় কয়েকটি অত্যন্ত মৌল চিন্তাকেই তিনি সম্প্রসারণ করে গেছেন এবং নিরন্তর develop করেছেন। তাঁর আকুলতা এতই এক সৎ ও বিবেকী মানুষের স্বার্থশূন্য আকুলতা for the cause he believed in যে তাঁকে খারিজ করা অসম্ভব। এই উন্মাদপ্রায় মানুষটি যা মিথ্যা তাকে মিথ্যা বলে বারবার আমাদের বিবেকের দরজায় ঘা মেরে গেছেন এবং আজ পশ্চিমবঙ্গে সকল সৃজনীশিল্পের জগতে চূড়ান্ত অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকেই যদি সবচেয়ে সুস্থমস্তিষ্ক মনে হয়, তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

ঋত্বিক ঘটকের লেখা প্রসঙ্গে এই মুখবন্ধের প্রয়োজন আমার কাছে অন্তত আছে। কেন-না ঋত্বিক ঘটক এমন মানুষ ছিলেন, যাঁর পক্ষে সততা এক আবশ্যিক ধর্ম এবং সেজন্যই যাঁর লেখা, ফিল্‌ম-চিন্তা, সবই পরস্পরের পরিপূরক ও সম্প্রসারণ। লেখার সময়ে একরকম লেখা চলে, বলার সময়ে আরেক রকম, ছবি করার সময়ে অন্যরকম, আত্মরক্ষা ও স্বার্থবৃদ্ধির এইসব নিরাপদ পন্থা তিনি জানতেন না। জানতেন না কথাটি ঠিক হল না, হাজার রকম আপস করলে জীবন নিরাপদ হয় তা তিনি জানতেন। কিন্তু তাতে তাঁর কোনো বিশ্বাস ছিল না। যা বাইরের চোখে তাঁর ব্যর্থতা, সে বিষয়েও প্রবল সততায় তিনিই বলতে পারেন, "আর, অনেক মারাত্মক ঘটনাই ঘটেছে, তার মধ্যে আমার ব্যর্থতা অতি তুচ্ছ একটা ঘটনামাত্র।" ('মানবসমাজ, আমাদের ঐতিহ্য, ছবি-করাও আমার প্রচেষ্টা')।

বন্ধনীর ভেতর যে-প্রবন্ধের নাম করা হল, সেটিই এই বইয়ের প্রথম দীর্ঘ প্রবন্ধ। নামকরণেই বোঝা যাচ্ছে অন্য কারও মতো চারিটি প্রসঙ্গ নিয়ে তিনটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার কথা লেখকের মনে হয়নি। তাঁর মনে হয়েছে সমগ্র ব্যাপারটি তাঁর চিত্রপ্রচেষ্টার সঙ্গে সমন্বিত এবং যেহেতু তাঁর চিত্র-ভাবনা, যেসব আইডিয়া তাঁকে ভাবতে ও কাজ করতে বাধ্য করায় তারই বাহন বা মাধ্যম, সেহেতু তিনি একই প্রবন্ধে প্রায় সকল বিশ্বাসকেই উপস্থাপিত করেন। Off the context বা সমগ্রের perspective-বিচ্যুত কোনো কিছুতেই, যেমন প্রচলিত 'কাগুজে' বা তথাকথিত 'ইনটেলেকচুয়াল' চিত্রসমালোচনায় তাঁর অবিশ্বাস। তাঁরই কথা, যে তিনি synthesis খোঁজেন এবং আদিম ও মৌল বিশ্বাসকে বর্তমানে perspective-এ উপস্থাপনা করে অতীতের যা গ্রহণ ও শ্রদ্ধাযোগ্য সেদিকে তাঁর চিত্রদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্তমানের ছিন্নমূল (দেশভাগ-জনিত ছিন্নমূলতা নয়) মানুষকে তার মূল সন্ধানে প্রয়াসী করেন। Archetype ও comparative mythology এইজন্যই তাঁর কাছে অনুশীলনীয় এবং তিনি বলেন, "সকল শিল্পকর্মেই বিভিন্ন স্তরে রস সঞ্চারিত হয়ে থাকে। অধিকারী ভেদে বিভিন্ন স্তর থেকে মানুষ রস গ্রহণ করে থাকে।" ছবির ব্যাপারে 'প্রাথমিক স্তরে একটা টানা গল্প হয়তো থাকে, বলে তিনি এই স্তরগুলি ব্যাখ্যা করে যান এবং শেষ অনুভূতির কথাটি এইভাবে বলেন, সে অনুভূতি অজ্ঞেয়কে স্পর্শ করে এবং তা অনির্বচনীয়। এও বলেন, "সত্যিকারের মহৎ শিল্প এর সবকটা স্তরকেই ছুঁয়ে যায়. এটা হচ্ছে মহৎ শিল্পের প্রাথমিক শর্ত।" এখানে আমাদের যা মনে হয়, যদিচ ঋত্বিক ঘটক গল্পের বা সাহিত্যের ওপর নির্ভর করে ছবি তৈরির ব্যাপারটিকে বারবার আলোচনা করেন, যদিচ ছবিতে সাহিত্য অ-নির্ভর সাবালকত্ব অর্জন করার ওপর জোর দেন। অথবা বলা চলে, তিনি বলেন ছবি দেখে মোটা গল্পের গরম, স্বাদু আস্বাদ লাভের ঐতিহ্য আমাদের দেশের ফিল্‌মকে স্বনির্ভর শিল্পমাধ্যমে উত্তরিত করবে না। তবু, তিনি জেনে গেলে আশ্চর্য হতেন, তাঁর লেখাগুলির বহু বক্তব্যই সাহিত্য-সমালোচনা ও বোধের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, মূল্যবান এবং প্রয়োগসাধ্য। এটি তাঁর মানসতা বোঝার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন-না তাঁর লেখা যতই প্রকাশিত হবে, হয়তো ততই দেখা যাবে তিনি লিখেছেন ফিল্‌ম বিষয়ে, কিন্তু তাঁর চিন্তা আমাদের সাহিত্য-মূল্যায়নে ধ্রুপদি

সংযোজন হচ্ছে। এটি খুবই দ্যোতক, কিন্তু আমরা যদি আসল ঋত্বিককে স্মরণ করি, এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে চিরকালই তথ্য ও সত্যে বিশ্বাসী—তাহলে এ কথা মানতেই হবে, রক্তমাংসের ঋত্বিক সকল গুণাগুণসহ অত্যন্ত মৌলিক মানুষ ছিলেন। তাঁর সবকিছুই ভালো ও মন্দ, স্বকীয় ও নিজস্ব। নিজের মতো নিজে হওয়া আজকাল হয় কেউ হয়, নয় কেউ কঠোর পরিশ্রমে অর্জন করে। তাঁর সুবিধা, তাঁকে সে পরিশ্রম করতে হয়নি। এবং শিল্প, সমগ্র শিল্পবোধের ক্ষেত্রেই মৌলিক চিন্তা তখনই দ্যোতক ও প্রয়োজনীয়, যখন একজনের এক বিষয়াশ্রিত চিন্তা সময় ও বিষয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেও 'অন্যান্য বিষয় আয়ত্তের সময়ে relevant থেকে যায়। সেই অর্থে ঋত্বিকের প্রবন্ধ পাঠ সাহিত্যচর্চার পক্ষে আবশ্যিক হয়ে উঠলে আমাদেরই ভালো, কেন-না মৌলিক ও স্বকীয় চিন্তা আজকাল অতীব বিরল। তবে 'একেবারে গভীরে গিয়ে সেই অনির্বচনীয়'—এ উক্তিতে আমার আপত্তি, কেন-না মহৎ শিল্পকর্মের, তা যদি ছবির ক্ষেত্রে Nazarinও হয়, তবু শেষ অনুভূতিটি emotional ken-এর সঙ্গে cerebral ken-এর আয়ত্তেও থাকে, বোদ্ধা দর্শকের কাছে। মহান ছবি যা যা হয়েছে, সেগুলির শেষ অনুভূতিও কী জাতের হল তাও বোধগম্যতায় না থাকলে দর্শক হিসাবে আমি নিশ্চয়ই ব্যর্থ। ঋত্বিক-উল্লিখিত কয়েকটি ছবির নাম করেই বলা যায়, Nazarin; Passion of Joan of Arc; La Dolce Vita; Battleship Potemkin; এগুলির শেষ অনুভূতিতে দর্শক নিশ্চয়ই নিদারুণ তীব্রতায় উত্তরিত হন মহানের আস্বাদপ্রাপ্তির অমরায়, কিন্তু তাকে অজ্ঞেয়, অনির্বচনীয় বলব কেন? আধুনিক মন 'অজ্ঞেয়' বলে শিল্পাস্বাদনের অনুভূতিকে মানবে কেন? 'For me not to know is to perish'—এই তো আধুনিক মানসের কথা। অবশ্য দুর্জ্ঞেয়ের সঙ্গে সম্মুখীন হবার কথা তিনি অন্যত্রও বলেছেন। তবু এ প্রসঙ্গটি আরেকটু বিস্তৃতায়িত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমরা যদি এইভাবে দেখি, Battle of Algiers; Seventh Seal ও Rashomon তিনটি ভিন্ন রসাশ্রিত ছবির শেষ স্বাদ কী তা আমাদের বোধায়ত্ত এবং এও বোধায়ত্ত যে মহান চলচ্চিত্র দেখলাম, তাহলে বোধকরি আমার বক্তব্য পরিষ্কার হয়। ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক'; 'কোমল গান্ধার'; 'সুবর্ণরেখা' ও 'মেঘে ঢাকা তারা'—কোন্ ছবি থেকে শেষ স্তরে দর্শকের কী পাবার তা তিনি নিজেই একাধিক লেখা ও সাক্ষাৎকারে বিবৃত করেছেন। অতএব ধরে নেওয়া যায় কোথাও ঋত্বিক নিজেই 'অনির্বচনীয়' প্রসঙ্গে স্বকীয় উক্তির বিরোধিতা করেছেন। এ স্ববিরোধিতা তাঁর চিন্তায় শেষ অবধি উপস্থিত এবং অন্য ক্ষেত্রে তা পরিণামে চিন্তা থেকে জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাঁর জীবনচর্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে বিনাশকারী হয়েছিল, যার শেষ চেহারা দেখা গেল ফেব্রুয়ারিতে সকালের কাগজে, কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। এই প্রবন্ধেই তিনি archetype প্রসঙ্গে বহু কথা বলেছেন। ফেলিনি প্রসঙ্গে তাঁর কথা আমরা গ্রহণ করতে পারি, যদিচ La Dolce Vita যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকর্ম, সেহেতু তা অন্যান্য বিশ্লেষণও চলিষ্ণু করে। এবং 'পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাকরুণ সম্পর্কে ঋত্বিকের ব্যাখ্যা সকলে গ্রহণ না-ও করতে পারেন। Nazarin ছবির নায়ক প্রসঙ্গে তিনি একই সঙ্গে তাকে archetypal বলেন, জিশুখ্রিস্ট-সদৃশ বলেন ও 'নাজারিন ও লুই বুনুয়েল' প্রবন্ধে জিশুখ্রিস্টকে ডন

কুইকজোটের সঙ্গে 'archetypes of fool' বলেন। সেখানে আমাদের মনে হতে পারে নায়ককে প্রথম থেকেই নির্বোধের প্রত্নপ্রতিম বলা যেতে পারত। কিন্তু বুনুয়েল প্রসঙ্গে ঋত্বিক বিষয়ে পরে বলা যাবে। আলোচ্য প্রবন্ধে ('মানব সমাজ'...') তিনি 'অযান্ত্রিক' ছবির বিমলকে বলেন archetypal এবং বলেন, "বুলাকি পাগলা তার absurd extension এবং নৃত্যপরায়ণ আদিবাসী ওরাওঁরা তার sublime extreme। পিয়ারা সিং হচ্ছে tough-minded as opposed to tendermindedness of বিমল। কাদা-ছোড়া বাচ্চার দল বিমলের আর একটা রূপক এবং সঙ্গে সঙ্গে কবি-জীবনের নিষ্ঠুরতার প্রতীক।" কথাগুলি সাহিত্য পাঠকের কাছে আগ্রহোদ্দীপক এবং এর প্রয়োগসাধ্যতার সম্ভাবনা খুবই ব্যাপক। ঋত্বিকের কথাগুলি সাহিত্যের ক্ষেত্রে টেনে এনে এইভাবে বলা চলে, তাঁর এই তত্ত্ব বা তাঁর এই ছবির অস্থিসংস্থান আমরা অন্যত্র, তত্ত্ব-প্রযুক্ত উপন্যাসে দেখেছি—যেমন Catch-22 উপন্যাসে য়োসারিয়ান যেহেতু সবচেয়ে স্বাভাবিক সেহেতু সে-ই সেখানে সকল স্বাভাবিকতাসহ পিয়ানোলা বা বিংশশতকীয় পৃথিবীতে আজ অ্যাবসার্ড হিসেবে উপস্থাপিত এবং অন্য চরিত্রগুলি তার সেই সত্তার সম্প্রসারণ, যে-সত্তা স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পারে না ও ক্রমে প্রতিহিংসা-লোভ-লালসা-ক্ষমতাপ্রিয়তা এ সকলের একেক চূড়ান্ত প্রতীকীয়তা অর্জন করে। যদিও য়োসারিয়ানসদৃশ আরও কয়েকটি গৌণ চরিত্রও আছে। বুলাগাকভের The Master and Margarita উপন্যাসে বর্বর ব্ল্যাক হিউমারের আধারে বিশ্লেষণী নির্মমতায় লেখক দেখান, কীভাবে জিশু, জিশুর মৃত্যু-বিধায়িতা পন্টিয়াস পাইলেট ও শয়তান একই মৌল অস্তিত্বের পরিপূরক ও সম্প্রসারণ হয়। ঋত্বিকের সকল তত্ত্ব আমরা গ্রহণ করতে না-ও পারি, কেন... শহরকে তিনি আরেক মানবতাবিনাশকারী প্রতীক হিসাবে দেখেন এবং অন্যত্র বলেন, "আমার যে protagonist, বিমল, তাকে পাগল বলতে পারেন, শিশু বলতে পারেন, আদিবাসী বলতে পারেন। কারণ এক জায়গাতে এই তিনই এক। সেটা হচ্ছে জড় বস্তুতে প্রায় আবেগ [আরোপ?] করার প্রবণতা। এবং এটি একটি Archetypal reaction, আদিম প্রতিক্রিয়া, শিশুর যে কোনো অসার বস্তু দেখে জুজু কল্পনা করা, পাগলের মেঘ দেখে ক্ষেপে ওঠা এবং অনাহৃত আদিবাসীর প্রথম রেলগাড়ি দেখে তাকে দেবতা কল্পনা করা,—একেবারে একই প্রক্রিয়া" (চলচ্চিত্রচিন্তা : ঋত্বিক ঘটক। চিত্রবীক্ষণ, ঋত্বিক সংখ্যা)। এখন এ সরলীকৃত সমাধান আমরা মানি কী করে! পাগল বা যিশু বা আদিবাসী ছাড়াও এই শহরেও ট্যাক্সিচালক তাঁর ট্যাক্সি বিষয়ে, কারিগর তাঁর হাতিয়ার বিষয়ে জড়তে প্রায় জীবনারোপ করেই ভালোবাসেন। আর রেলগাড়ি দেখে শুধু আদিবাসীরা নন, রানিগঞ্জে প্রথম ইঞ্জিন-দর্শনে অ-আদিবাসী মানুষরাও তাকে দেবতা বা দানবই ভেবেছিলেন, ইতিহাস ও লোকগাথা তার সাক্ষ্য দেয়। 'মেঘে ঢাকা তারা'র 'উমার symbologyটা এখানে খুবই পরিষ্কার', বলেন তিনি এবং নীতা চরিত্রকে দেখেন গৌরীদান-প্রদত্তা মেয়ে হিসেবে। 'কোমল গান্ধার'-এর অনসূয়া প্রসঙ্গে প্রভাবিত হন রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা ও মিরান্দা নিয়ে লেখা প্রবন্ধ পড়ে। একদিকে শকুন্তলা-প্রতীকী অনসূয়া এবং অন্যদিকে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনের চেষ্টা, দুটিই প্রতিভাত করা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়। 'সুবর্ণরেখা'র

বহুরূপী তো তাঁর কাছে conrfonting primordial mother-এর archetype। যে-মাতৃকাশক্তি ভারতীয় মানসে সংহারিকা ও রক্ষায়িত্রী দুই-ই। বস্তুত বহু লেখায় তিনি archetype ও myth, symbol, symbology, 'সুবর্ণরেখা'র বহুরূপী, 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা, 'কোমল গান্ধার'-এর অনসূয়া প্রসঙ্গে শব্দগুলি ব্যবহার করেন তাঁকে প্রভাবিতকারী তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে। এখন ব্যাপার হল, তাঁর এই সকল বক্তব্যের সমালোচনায় এই বলা যায়, একটি তত্ত্বকে উপস্থাপিত করাই চিত্রনির্মাতার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কেন-না ফিল্‌ম-আস্বাদনে স্তরভেদে দর্শক স্ব-স্ব সাধ্যমতো আনন্দ আস্বাদ করবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সবই করবেন ছবিটি দেখে, এটি ভিসুয়াল আর্ট। চিত্রপরিচালক তাঁর বক্তব্যকে দর্শকের কাছে কতটা বোধ্য করে তুলতে পেরেছিলেন উল্লিখিত তিনটি ছবি ও 'অযান্ত্রিক' প্রসঙ্গে? এই চারটি ছবিই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে অসীম গুরুত্বপূর্ণ এবং 'অযান্ত্রিক' নিশ্চয়ই বিশ্বচলচ্চিত্রের নিরিখেও মহান ছবি নিজ দাবিতেই। আমি এখানে বলব, ঋত্বিক নিজের ছবি বিষয়ে স্ব-বক্তব্য পরিষ্কার বলে উত্তরকালের দর্শককে তো বটেই তাঁর সমসময়ের দর্শককেও তাঁর ছবি বিষয়ে গভীরতর আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ নিয়ে দেখার ও বোঝার সহায়তা করে গেছেন। কিন্তু তার পরেও, তাঁর মতানুযায়ী শ্রেষ্ঠ দর্শক যিনি, আর তাঁর মতই বা বলি কেন, সকল সিরিয়াস পরিচালকই নিশ্চয় বক্সঅফিস—m.g.—পয়সা মেলা এসবের পরেও তাঁর ছবির স্থায়িত্বের জন্য বোদ্ধা দর্শকের ওপরই নির্ভর করবেন—সেই বোদ্ধা দর্শকও ঋত্বিককে সবিনয়ে বলতে পারেন—archetypal conception আমাদের ঐতিহ্যে নিশ্চয়ই আছে। এবং মানসিক নৈরাজ্য ও চিন্তাদৈন্যের এক প্রধান কারণ ঐতিহ্য-অচেতনতা, তাও সত্যি। কিন্তু যেহেতু অন্ধকার থেকে উত্তরণই কাম্য, archetype-image ফিল্‌মে আমার ততখানিই দরকার, যে-image উত্তরণ ঘটাবে মানসে, যা relevant হবে আজকের প্রেক্ষিতেও, এবং যাকে আজকের এবং ভবিষ্যতের পক্ষেও প্রয়োজনীয় মনে হবে আমার। এখানে 'আমি' ব্যক্তি আমি নই। সকলে ঋত্বিকের লেখা পড়বেন তা যখন না-ও হতে পারে, পরিচালকের সকল তত্ত্বের visual clarification পর্দাতেই থাকা উচিত। তারপর গ্রহণ, আধাগ্রহণ, বর্জন, আংশিক বর্জন দর্শকের ওপর। 'নাজারিন' বা 'জোরবা দ্য গ্রীক' দেখলে আমি ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেও বুঝি, 'অযান্ত্রিক' দেখলেও। তবে ঋত্বিকেব বক্তব্যবিষয়ে সবচেয়ে বড়ো কথা হল, তত্ত্বের অস্থিসংস্থান-সংবলিত কয়টি ছবির কথা ভারতীয় প্রেক্ষিতে মনে করতে পারি আমরা? অবশ্য, বহিরঙ্গে যিনি প্রায় সকলকে ধারণা দিয়ে যেতেন, তিনি চিন্তায়-কথায়-কর্মে নিদারুণভাবে অ-সুসংবদ্ধ, ভেতরে তাঁর দৃষ্টি সর্বদাই সত্যসন্ধী এবং নিজের বিশ্বাস যদি ভুল মনে করেন তা স্বীকারেও তিনি মুক্তকণ্ঠ। তাই দেখতে পাই, 'মানব সমাজ, আমাদের ঐতিহ্য, ছবি-করা ও আমার প্রচেষ্টা'; 'আমার ছবি'; 'কোমল গান্ধার প্রসঙ্গ'; এইসব প্রবন্ধে, এবং অন্যত্র তিনি archetype ও myth এবং দেশভাগ-জনিত তাঁর মর্মবেদনার কথা বারবার বলেছেন। প্রথম প্রসঙ্গটি এর মধ্যেই আলোচিত হয়েছে, দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি ঋত্বিকের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি ঋত্বিককে অত্যন্ত প্রভাবিত করে. এ তাঁর মুখের কথায়, লেখায় এবং ছবিতে

প্রমাণিত। বিশেষ 'কোমল গান্ধার'-এ। এই প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে হবে 'সুবর্ণরেখা'র কথা বলছি না কেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, "প্রত্যক্ষস্তরে 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে উপস্থাপিত সংকট উদ্বাস্তু সমস্যাকে অবলম্বন করে আছে। কিন্তু 'উদ্বাস্তু' বা 'বাস্তুহারা' বলতে এ-ছবিতে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদেরই বোঝাচ্ছে না—ওই কথাটির সাহায্যে আমি অন্যতর ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছি। আমাদের দিনে আমরা সকলেই জীবনের মূল হারিয়ে বাস্তুহারা হয়ে আছি—এটাও আমার বক্তব্য। 'বাস্তুহারা' কথাটিকে এইভাবে বিশেষ ভৌগোলিক-স্তর থেকে সামান্য-স্তরে উন্নীত করাই আমার অন্বিষ্ট। ছবিতে হরপ্রসাদের সংলাপে, 'আমরা বায়ুভূত, নিরালম্ব'; কিংবা ছবির প্রথমেই প্রেসে একজন কর্মচারীর মুখে, 'উদ্বাস্তু! কে উদ্বাস্তু নয়?'—এই কথায় সেই ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে।" ('সুবর্ণরেখা; পরিচালকের বক্তব্য')। এই প্রবন্ধেই তিনি বলছেন, "এই যে আমাদের দেশের সংকট, যেটা আমাদের মধ্যে সর্বনাশ ডেকে এনেছে, তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা আমার পবিত্র কর্তব্য বলে আমার ধারণা।"

এখন, পরিচালকের যদি-বা অভিপ্রেত ছিল উদ্‌বাস্তুতার প্রত্যক্ষ স্তরকে সামান্যস্তরে নিয়ে যাওয়া, তবু, এমনকি সিরিয়াস দর্শক, সমালোচক, এঁদের মনেও আজও ধারণা বদ্ধমূল যে, ঋত্বিক দেশভাগ ও উদ্‌বাস্তু সমস্যা নিয়েই পীড়িত থেকে চলে গেলেন এবং 'সুবর্ণরেখা' তাঁর হৃদয়বেদনার দলিল। 'সুবর্ণরেখা'র ওপরেই তাঁদের জোর, কেন-না 'কোমল গান্ধার' ছবিতে ওই প্রসঙ্গে পরিচালকের বক্তব্য বোধহয় তাঁদের কাছে স্পষ্ট নয়। এ-বিষয়ে আমার বক্তব্য, দেশভাগ ও দুই বাংলার বিচ্ছেদীকরণ নিশ্চয়ই ঋত্বিকের চিন্তাকে আবিষ্ট, ব্যথিত, পীড়িত রেখেছিল। কিন্তু তার চেয়েও তাঁকে যন্ত্রণা দিত চতুর্দিকের মানব-নৈরাজ্য। সেই ছিন্নমূলতাকে দলিলীকরণই তাঁর স্ব-কর্তব্য মনে হয়েছিল। এবং দেশভাগ বিষয়ে তাঁর মর্মপীড়া এতই গভীর ছিল যে, একাধিক লেখায় দেখতে পাব দেশ ও মানুষের এই নগ্ন দেউলেপনার জন্য তিনি দেশভাগকে বারবার অভিযুক্ত ক'রে গেছেন। এইখানে আমার বক্তব্য হল, ঋত্বিকের মধ্যে শেষাবধি অশেষ রোমান্টিকতা এবং শিশুর মতো বাস্তবকে অবুঝ জেদে অস্বীকার করে চলার একটি ব্যাপার স্বভাবেই ছিল। আর যা ছিল, ঋত্বিক-অনুরাগীরা রাগুন আর যাই মনে করুন, আর ছিল সেই ইতিহাস-চেতনার অভাব যা প্রেক্ষিত প্রাপ্তি এনে দেয়। ইতিহাসচেতনা থাকলে যিনি এত বিষয়ে এত জানতেন, তিনি বুঝতেন, তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোর খুবই sheltered ছিল বলে, দেশের গ্রাম-মাঠ-নদী-মানুষ তাঁকে প্রাণরস জোগাত বলে, (আমি ও তিনি এইসব অভিজ্ঞতাই একই সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করেছি, এটুকু নিজের কথা বলতে বাধ্য হলাম) দেশ-মানুষ-জীবন কিছু সুখে ছিল না। দেশের, যে-চেহারা স্বাধীনতার পর থেকে দেখা গেল, ইতিহাসচেতনার ফলে যে-বিশ্লেষণী পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান জন্মায় তা ঋত্বিকের থাকলে তিনি বুঝতেন, এই নৈরাজ্য নগ্নতা ছিন্নমূলতা হঠাৎ স্বাধীনতার পরই গজিয়ে ওঠেনি। দেশের ইতিহাস যে-পথে চলছিল তাতে ঠিক ঠিক ইতিহাসসম্মত পরিণতিই ঘটেছে এবং আমরা জাতিগতভাবে এর চেয়ে ভালো অবস্থা হবার মতো কোনো কাজ কোনো ফ্রন্টেই করিনি। অবশ্যই দেশভাগের পর সমস্যাগুলি তীব্রতর, গগনচুম্বী হয়েছে, রক্তবীজের

জেদে প্রবর্ধিত হয়েছে সর্বনাশ, কিন্তু তার বীজ বপন লালনপালনের কাজ বহুকাল আগে থেকে চলছিল। ইতিহাসে আকস্মিক কিছু হয় না। ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় আছে নির্মম যুক্তিবাদ। বহু বছর ধরে দেশ ও মানুষের সকল শুভকে উপেক্ষা করে দুয়ে দুয়ে পাঁচ করার খেলা চলতে থাকলে তার চেহারা এইরকমই হয়। ঋত্বিক প্রসঙ্গে 'শিশু' কথাটি আমি ইচ্ছা করে ব্যবহার করেছি এবং ঋত্বিক সংখ্যা 'চিত্রবীক্ষণ' কাগজে ঋত্বিকের স্ত্রীর লেখায় পাঠক দেখবেন, ঋত্বিকের মানসিকতার ক্লিনিকাল বিশ্লেষণে ডাক্তার বলেছিলেন 'ইন্‌ফ্যানটাইল' এবং 'ডাবল পার্সোনালিটি'। তিনি এ-প্রসঙ্গে যা ভাবেন তা সবটা ঠিক নয়, এ কথা বলতে গেলে যেরকম অসহিষ্ণু হতেন ও খেপে যেতেন তা শিশুই পারে। বহু বিষয়ে শিশুর জেদে বাস্তবকে অস্বীকার করে জেদের ভরে চলার কথা মনে পড়ে। কিন্তু পৃথিবী তো জানত না মানুষটির আধখানা ব্যক্তিত্ব শিশুর, সেই অসম্ভব মাতৃমগ্নচিন্তা, সেই বাস্তব গ্রিক পুরাণের হায়ড্রার মতো শত শত ক্ষুধার্ত মাথা তুলে গ্রাস করছে দেখেও হেসে উড়িয়ে দেওয়া—এবং এর জন্য তিনি ক্ষমাও পাননি। বাস্তবকে ক্রমান্বয়ে অস্বীকার করে চলার ফলে কখনো-কখনো শাস্তি নির্মম হতে পারে, তার পরিণাম তাঁকে ফেব্রুয়ারির রাতে মুখে চাদর টেনে দিয়েছিল। হয়তো মাঝে মাঝে ব্যক্তি 'আমি' এসে পড়ছি না চাইলেও, কিন্তু প্রসঙ্গ যেখানে 'ঋত্বিক' সেখানে পাঠক ও সম্পাদক আমাকে সামান্য ক্ষমা দেখাবেন আশা করি। তবে দেশভাগ নিয়েই তাঁর সমগ্র মানসিক ক্লেশ এবং 'সুবর্ণরেখা' সে যন্ত্রণার চির-দলিল এ কথা এই সেদিন তাঁর উত্তর-মৃত্যু চিত্র-উৎসব প্রসঙ্গেও একজন সাংবাদিক লিখেছেন। তাঁর এ-বিষয়ক চিন্তা যদি ওখানেই থেমে থাকত তাহলে তাঁর সম্পর্কে আশাভঙ্গ ঘটত। কিন্তু আগেই বলেছি, তিনি সত্যসন্ধী এবং যেহেতু শেষ অবধি ছিলেন মনে মনে আশ্চর্য জঙ্গম, চলিষ্ণু, স্রোতস্বান্, (এ প্রসঙ্গে পরে আরও বলব—) সেহেতু এই একই বিষয়ে তিনি ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে অকপটে বলেছেন, "বাংলাদেশ বলতে আমার যা ধারণা ছিল, ঐ দুই বাংলা মিলিয়ে সেটা যে তিরিশ বছরের পুরানো সেটা আমি জানতাম না। আমার কৈশোর এবং প্রথম যৌবন পূর্ব বাংলায় কেটেছে। সেই জীবন, সেই স্মৃতি, সেই Nostalgia আমাকে উন্মাদের মতো টেনে নিয়ে যায় তিতাসে, তিতাস নিয়ে ছবি করতে।...একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা আমাকে, সত্যজিৎবাবুকে এবং আরও কয়েকজনকে State guest করে নিয়ে গিয়েছিল ঢাকায়। প্লেনে করে যাচ্ছিলাম, পাশে সত্যজিৎবাবু বসে, যখন পদ্মা cross করছি তখন আমি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম। সে বাংলাদেশ আপনারা দেখেননি, সেই প্রাচুর্যময় জীবন, সেই সুন্দর জীবন...আমি যেন সেই জীবনের পথে চলে গেছি সেই জীবনের মাঝখানে...এখনও যেন সব সেরকম আছে, ঘড়ির কাঁটা যেন এর মাঝে আর চলেনি। এই বোকামি নিয়ে, এই শিশুসুলভ মন নিয়ে 'তিতাস' আরম্ভ। ছবি করতে করতে বুঝলাম সেই অতীতের ছিটেফোঁটা আজ আর নেই, থাকতে পারে না। ইতিহাস ভয়ংকর নিষ্ঠুর, ও হয় না, কিস্‌সু নেই, সব হারিয়ে গেছে।...তখন ক্রমশ দেখলাম সমস্ত জিনিসটা ফুরিয়ে গেছে মানে একেবারেই গেছে, আর কোনোদিন ফিরবে না, এটা খুবই দুঃখজনক আমার কাছে, কিন্তু দুঃখ পেলে কি হবে, ছেলে মারা গেলে লোকে শোক করে কিন্তু it is inevitable.।"

(চিত্রবীক্ষণ, ঋত্বিক সংখ্যা, পৃ ৬৮-৬৯)। মনে করি এরপর কেউ মনে করবেন না ঋত্বিক দেশভাগ প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তাকে এক জায়গাতেই আবদ্ধ রেখেছিলেন এবং 'সুবর্ণরেখা'র মূল্যায়ন কালে প্রত্যক্ষ-স্তর গৌণ করে সামান্য-স্তরে ঋত্বিকের প্রচেষ্টার সাফল্য-অসাফল্য বিচার করবেন। আগেই বলেছিলাম archetype-myth-symbol এবং দেশভাগ মানুষের মনোজগতের ঐতিহ্যহীনতা-জনিত ছিন্নমূলতা, দুটি চিন্তা তাঁর 'সুবর্ণরেখা' নির্মাণ অবধি সবচেয়ে আধিপত্য বিস্তারকারী চিন্তা থেকেছে। প্রথম প্রসঙ্গটিতে তিনি শেষ অবধি বিশ্বস্ত ছিলেন। দেশভাগের বাস্তব ঘটনা বিষয়ে তাঁর মতপরিবর্তন ঘটেছিল। মানুষের নৈরাজ্য বিষয়ে প্রবল যন্ত্রণা তাঁর মনে শেষ পর্যন্ত ছিল।

ঋত্বিক-কৃত চিত্রনির্মাণ-যুগের প্রথম চারটি ছবি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ও আমার যা মনে হয়েছে তা বলা হল। এই বইয়ের অন্যান্য প্রবন্ধে তিনি অনেক বিষয়েই অনেক কথা বলেছেন এবং যাঁরা ছবি করেন, যাঁরা অন্য শিল্পমাধ্যম নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের চিন্তা করবার মতো বহু বক্তব্যই সেসব লেখায় আছে। যেমন 'সুবর্ণরেখা : পরিচালকের বক্তব্য' প্রবন্ধে তিনি উক্ত ছবির কাঠামোতে তার অসংগতি সম্পর্কে সব অভিযোগ মেনে নিয়ে সহসা বলেন, "একটা কথা শুধু ইঙ্গিতে রেখে যাই—সেটা নিয়ে চিন্তাশীল পাঠক ভেবে দেখতে পারেন। ব্রেখ্‌টের 'থ্রি পেনি অপেরা'য় লণ্ডন শহরের ছাপ একফোঁটাও পড়েনি। লণ্ডন শহরটা কীরকম সেটা জানতে ব্রেখ্‌ট সাহেবের অসুবিধে না হবারই কথা। কিন্তু যান্ত্রিক-স্তরে লণ্ডন শহর কেমন, তার সুসংগতরূপ কীরকম হবে ইত্যাদি ব্রেখ্‌ট সাহেব জানার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেননি, এবং তাতে তাঁর বক্তব্য একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি। আমি শুধু এই কথাটিই বলতে চাইছি যে, অনেক সময় যান্ত্রিক-স্তরের ঘটনাগুলিকে উপেক্ষা করতে হয়। এবং তাতে মাঝে মাঝে ফলও মেলে।"

কথাগুলি সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সাহিত্যবোধের ক্ষেত্রে নিতান্ত আবশ্যিক। কেন-না সাহিত্যে সমগ্র বাস্তবের কঠোর নিয়মানুগ দলিলীকরণে একভাবে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা যায়। 'ফর্টি সেকেন্ড প্যারালাল' বা 'গ্রেট মিডল্যান্ড' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এবং যান্ত্রিক-স্তরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বহিরঙ্গের বাস্তবতাকে একেবারে বর্জন করে প্রতীকায়িত, কখনও-বা অ্যাবসার্ড, কখনও-বা আনরিয়্যাল পন্থা ধরে প্রেয় বক্তব্য উপস্থাপনের যে-পন্থার কথা ঋত্বিক বলেছেন, সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত বলতে এখনই মনে আসছে 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' এবং 'ক্যাচ-টুয়েন্টি টু'। ফর্স্টারের ভারত যান্ত্রিক-স্তরে ভারত নয়, যান্ত্রিক-স্তরে তার সবই আনরিয়্যাল, কিন্তু ১৯২৪-এর ভারত নামক ট্র্যাজিক সত্যের নিকটতম সান্নিধ্যে ওই বইটিই পৌঁছেছিল, এবং পিয়ানোলা দ্বীপে যা ঘটে তা কখনোই একটি ভৌগোলিক আয়তনে, দ্বীপে ঘটা সম্ভব নয়, আর অসম্ভব বলেই তা যুদ্ধের ব্যর্থতা ও আমেরিকা মহাদেশের স্বরূপ দর্শনের নির্ভরযোগ্য এক নিরিখ। মানবসভ্যতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে এবং ব্যক্তিমানুষের অসহায়তা প্রদর্শনে যেমন দুই অ্যাবসার্ড কাহিনি, গালিভারের কাহিনি ও ডন কুইকজোটের কাহিনি দুই সময়-পরাভূতকারী নিরিখ। এই প্রবন্ধে আরও মূল্যবান কথা আছে। যেমন '....ঐ ভাই যে কোনো মেয়ের ঘরেই যেত, সেও কিন্তু ওর বোনই হত'—নৈতিকতা-সন্ধানী মূল্য-বিশ্বাসে আকাঙ্ক্ষী এবং সর্ববঞ্চিত ব্যক্তিমানুষের পরিপ্রেক্ষিতে উক্তিটির প্রয়োগসাধ্যতা সমাজব্যাপী।

বাইরে যাঁর সবই এলোমেলো, চিন্তায় তিনি সর্বদাই স্বকীয়, সত্যসন্ধী, বিবেকী ও নির্মমভাবে সত্যপ্রিয়। শুধু স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সবকিছুই তিনি নিজের চশমাতেই দেখেন এবং 'নাজারিন ও লুই বুনুয়েল' প্রবন্ধে রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও হিন্দুধর্ম নিয়ে অকপট স্বচ্ছতায় বলেন, রোমান ক্যাথলিক চার্চ হিন্দুধর্মের তুলনায় অনেক বেশি আক্রমণসাধ্য। বলেন, "...Organized Church একটা ইন্সটিটিউশন হিসেবে, বিশেষ করে, মধ্যযুগের বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে, চমৎকার একটি target, আমরা ও পুণ্যে বঞ্চিত। আমাদের লড়াই করতে হয় হাজারো Cross Current-এর সঙ্গে, যা কখনোই tangible object হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় না। হিন্দুধর্ম সেদিক থেকে অনেক ফিচেল এবং বদ।...সেদিক থেকে Roman Catholicism অনেক বেশি বোকা। Heresy কথাটাকে যত্রতত্র প্রয়োগ ক'রে এবং Pope the Pontifex ব্যাপারটিকে খাড়া করে, তারপর চুটিয়ে Inquisition চালিয়ে একটা অত্যন্ত tangible Goliath খাড়া হয়ে উঠেছে, যাকে যে কোনো শিল্পী David গুলতি মারতে পারে।...আজো ঐ সভ্যতার মানুষের মনে এই ধর্ম ব্যাপারটা বিশাল স্থান অধিকার করে আছে। অতি-অধুনা রোমান-ক্যাথলিক John Kennedyর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটা ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে।" আমার মনে হয় চিন্তাশীল দর্শকের (এ দেশের) পক্ষে কথাগুলি হয়তো সহায়ক হবে এবং বেয়ারিম্যান, বুনুয়েল ইত্যাদি পরিচালকদের ভিন্ন ভিন্ন রসের ছবি আস্বাদনে কথাগুলি কোথাও না কোথাও বোধগম্যতাকে প্রসারিত করবে।

চিত্রশিল্পের জগৎ সম্পর্কীয় লেখার মধ্যে 'নিরীক্ষামূলক ছবি'; 'আজকের ছবির গতি-পরিণতি'; 'ছবিতে শব্দ'; 'সারি সারি পাঁচিল'; 'শিল্প, ছবি ও ভবিষ্যৎ'; 'শিল্প ও সততা'; বাংলা ছবির চিন্তাশীল দর্শকমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য। কোনো প্রবন্ধে তিনি, বাংলা ছবির যা হচ্ছে তার প্রসঙ্গে 'আভা-গার্দ'; 'নিওরিয়েলিজম'; 'এক্সপেরিমেন্ট'; 'নিও-ফ্যান্টাসী'; 'নিও-রোমান্টিসিজ্‌ম' কথাগুলি কত অপ্রযোজ্য বা বহু শত্রুতা আবাহন করেও বলেন। অবশ্য 'নিও-ফ্যান্টাসী' সংজ্ঞাটি বিষয়ে আমি একমত নই। কেন-না বাংলা ছবি যা হরদম হয়, যেহেতু তাতে গল্প (আমিও তাতে আছি), মানুষ, ঘটনা, পরিবেশ, জীবন যেরকম দেখা যায় তা যদি ফ্যান্টাসি না হয় তবে ফ্যান্টাসি কী? কোনো প্রবন্ধে তিনি দর্শক ও সমালোচককে কঠিনের সাধনা ক'রে বয়স্কমন্য হতে বলেন। কোথাও ছবি তৈরির পেছনে প্রযোজক-পরিবেশক-প্রদর্শকের ঈশ্বরপ্রতিম হয়-কে নয় এবং নয়-কে হয় করার ক্ষমতার কথা বলেন। এবং যেহেতু এঁরাই এখনও চিত্রশিল্পের রাখনে ও মারনেওয়ালা সর্বেসর্বা, সেহেতু 'সারি সারি পাঁচিল'-এ এ-অবস্থা থেকে যুক্তির পথও বিবেচকের মতোই আলোচনা করেন। তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল চিত্র-সমালোচকরা যে নিজেদের প্রিয় প্রেমিসকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে ইষ্টের চেয়ে অনিষ্টই করেন সে কথাও তিনি বলতে ছাড়েন না। আবার 'একমাত্র সত্যজিৎ রায়' প্রবন্ধে সত্যজিৎ রায়কে মুক্তকণ্ঠে শ্রদ্ধা জানান।

এর আগে তাঁর চলিষ্ণু ও স্রোতস্বান্‌ মানসিকতার কথা বলেছি। বলেছি সে বিষয়ে পরে আরও বলার আছে। যা বলার আছে তা সম্ভবত খুব অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই যে

লেখাগুলি, এগুলি বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন : "...আমার লেখাও মাঝে মাঝে বেরোয় শুনেছি, লেখা নিয়েও যায় আমার কাছ থেকে। কিন্তু সাত্যি বলছি, magazine আমি বিশেষ পড়ি না।" এই যে অনিয়মিত হেলাফেলায় লেখা, এর মধ্যে একটি জিনিস ঋত্বিক প্রসঙ্গে পরিস্ফুট, চিন্তায় তাঁর অসংবদ্ধতা ছিল না। অত্যন্ত গভীর, তন্নিষ্ঠ স্বকীয় চিন্তা ব্যতীত এমন লেখা কেউ লেখে না। তার মানে এই নয় তাঁর সকল মতই গ্রাহ্য বা স্বীকৃত হবে। হবে না। বিতর্কের অবকাশ থাকবে। সেখানেই তাঁর সার্থকতা। একটি গেলাস থেকে আর এক গেলাসে যাবার মাঝামাঝি সময়েও তিনি আমাদের ভাবাতে, রাগাতে, অসহিষ্ণু-সশ্রদ্ধ-বিস্মিত করাতে পেরেছেন। আর চিত্রপরিচালকের এত বক্তব্য থাকবে, যা কখনও সাহিত্যবোদ্ধাকেও সহায়তা করবে, এটি খুবই প্রয়োজনীয় আমার কাছে। চলিষ্ণু মনের কথা কেন বলছি? এখন তাঁর জীবনে যেতে হয়। ঋত্বিক যা লিখেছেন, যা বলতেন, কখনও কোথাও কোনো হতাশা, ব্যক্তিগত আক্রোশ বা বিদ্বেষ, যাকে বলে malice, তা তাঁর মধ্যে ছিল না। যে-চারটি ছবির নাম এই বইয়ে এসেছে, সেগুলি বিষয়ে বলতে গিয়েও তিনি নিজের হতাশা, ব্যর্থতার কথা গৌণ করেছেন, নস্যাৎ করেছেন, এবং সব লেখাতেই দেখব তাঁর প্রবল উদ্‌বেগ সার্বিক মঙ্গলের জন্য, শিল্পী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোক এই কামনায় ('শিল্প ও সততা'), সেখানে একজন ঋত্বিকের ব্যর্থতা কিছু নয় তা নিজেই বলেছেন।

বলেছেন কোন মানুষ? পঞ্চাশ-বাহান্ন সাল থেকে, যখন থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত, IPTA-র কর্মী, পার্টির প্রচণ্ড বিরূপতা সহ্য করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্য একজনের কমিশনও গঠিত হয়। ১৯৫৫-তে বম্বে যাবার পর কলকাতা জেলা সম্পাদকের চিঠি যায়। পার্টি-সভ্য তালিকায় 'ঋত্বিক ঘটক' নামটি ভুল করে ঢুকে পড়েছিল [illegible] বাদ দেওয়া হল। 'অযান্ত্রিক' ছবির ক্ষয়ক্ষতি প্রযোজক বহন করেন। 'কোমল গান্ধার' superflop করায় (নিজের ছবি) দেউলে হয়ে যান। আলাউদ্দিন খাঁর ওপর তথ্যচিত্রে কাজ করলেও নাম পাননি। 'সুবর্ণরেখা'র কাজ অল্প বাকি থাকতে প্রযোজক চলে যান। একটি বিজ্ঞাপন-হ্রস্বচিত্র করে সেই টাকায় শেষ করেন ছবি এবং পরে জানেন প্রযোজক কোনো পরিবেশককে ছবি বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে চলে গেছেন। যেহেতু এই বইয়ে 'যুক্তি তক্কো ও গপ্পো' বা 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির বিষয়ে কোনো কথা নেই সেহেতু আমিও ওগুলি নিয়ে কিছু বলিনি। কিন্তু 'চিত্রবীক্ষণ' ঋত্বিক সংখ্যায় দুটি সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক প্রথম ছবির বিষয়বস্তুর কথা বলেছেন, দ্বিতীয় ছবির বাংলাদেশীয় প্রযোজকের প্রভূত প্রশংসা করেছেন মুক্তকণ্ঠে ও মনে। ওই একই পত্রিকায় ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রীর লেখা থেকে জানতে পারছি (এই প্যারায় ব্যবহৃত সকল তথ্যই তাঁর লেখা থেকে প্রাপ্ত), "প্রথম ছবি করার সময়ে গলায় টিউমার ও প্রবল অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি যাঁদের সঙ্গে ছবি করছিলেন, প্রথম পর্যায়ে এই অবস্থায় তাঁকে ছবি করতে হয়, বম্বে থেকে F. F. C. টাকা পাঠালে দীপঙ্কর বড়ুয়া প্রথমে আমার সই, ও পরে নিজে সই করে সমস্ত টাকা ঘরে তুলতেন। একটি পয়সা আমাকে স্পর্শ করতে দেননি। ওদের ঋত্বিকদাকে কোনদিন গলায় Tumour-এর জন্য এক গ্লাস দুধ, বা একটি বিছানা বা কোনকিছুর ব্যবস্থা করতে

দেখিনি। অনেক সময় ল্যাবরেটারীতে can মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকতেন।" (চিত্রবীক্ষণ, ঋত্বিক সংখ্যা পৃ ২০)। দ্বিতীয় ছবির শুটিং শেষ করেছিলেন প্রবল জ্বর নিয়ে। সম্পাদনা সমাপ্ত করতে পারেননি। সম্পাদনাতে তাঁব হাত ছিল না সেটিই শেষ কথা নয়, তাঁর স্ত্রীর লেখা একটি বাক্য দ্যোতক, "Producer হাবিবুর রহমান প্রাপ্য টাকাও দেননি।" মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির পেছনের ইতিহাস কারও পক্ষেই কাম্য নয়। ঋত্বিকের বৈশিষ্ট্য হল তাঁর বক্তব্যে কোথাও নৈরাশ্য বা অবক্ষয়ের কাছে নতিস্বীকার নেই। এত ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গ—আর তাঁর পরিচালক জীবনেতিহাস তো আশাভঙ্গেরই ইতিহাস—কিন্তু নিজেকে ছাড়া কারও ওপরে দোষারোপ করেন না তিনি, কখনও তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত অনুভূতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, সর্বাবস্থায়, মালিন্য ও malice-মুক্ত থাকা মানুষ হিসেবে কত কঠিন কিন্তু পঞ্চাশে না পৌঁছোতে শুভ্রকেশ, স্বাস্থ্য ভগ্ন, বহুভাবে বঞ্চিত ঋত্বিক সে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। অবশ্যই বহুকিছুই তাঁর নিজের আচরণে ঘটে এবং তিনি নিজেই বলেন, 'feature ছবি না করার কারণ এক আমার ছন্নছাড়া জীবন। দুই হচ্ছে যে আমার ছবিগুলো দেখেছি, সে 'অযান্ত্রিক' থেকে আরম্ভ করে 'সুবর্ণরেখা' অবধি পাঁচখানা ছবিতেই, যখন releasc হয় চলে না, একদম চলে না। কয়েক বছর যাবার পর লোকের টনক নড়ে তখন খানিক দেখে টেখে। ...[পুনার চাকরি ছেড়ে আসার পরেকার কথা]...লোকের কাছে ভিক্ষে করব না, মাথা নীচু করব না, এইভাবেই চলছিল, এর মধ্যে drinkingটা ভয়ংকর বেড়ে গেল, বারবার অসুখে পড়তে লাগলাম, আপনারা সবই জানেন, পাগলা গারদের কথাও জানেন। তা এরই ফাঁকে ফাঁকে ছবিগুলো করেছি প্রচণ্ড অসুবিধের মধ্যে, কেউ পয়সা দিতে চায় না, ডকুমেন্টারির কাজ পাওয়া যায় না। নানা ধরনের ফ্যাঁকড়া। এর মধ্যে কোনটা একেবারে পয়সাবিহীন অবস্থায় করা, কোনটা একটু ভালোভাবে করা" (চিত্রবিক্ষণ, ঋত্বিক সংখ্যা পৃ ৬৭)। ঋত্বিকের জীবন সম্পর্কিত কথাগুলি এই জন্য বললাম, তাঁর বহু নৈরাশ্যের স্থপতি হয়তো তিনি নিজেই, তবু আলোচ্য লেখাগুলিতে কোথাও ব্যক্তিগত নৈরাশ্য বা আশাভঙ্গের ছায়াপাত ঘটেনি। আর, যদি বা তিনি নিজেও দায়ী হন, তবু সব দায়িত্ব কি তাঁর একারই ছিল? যদি তিনি বিশ্বাস-স্থাপনযোগ্য নাই হন, তবে কারা তাঁকে দিয়ে ছবি করিয়ে নিতেন বিনা পয়সায়? নিজের সকল দোষ-বিচ্যুতি স্বীকারে তো তিনি মুক্তকণ্ঠ, কিন্তু একজন ঋত্বিকের প্রতি সমাজের কোনো দায়িত্ব কি থাকে না? একজন বাঁধা পথের বাইরে পা বাড়ালে, তা ফিল্‌ম এবং বহু মানুষ বহু চক্র-নির্ভর শিল্প বলেই স্রষ্টাকে কেন এইভাবে শেষ হতে হয়? তাঁর সমগ্র জীবনের দুঃখময় পরিণাম কি তিনি এরকমটি করতে ভালো লাগত বলেই করেছিলেন? যে-সিনেমাজগতের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট, সে জগতের কি কিছুই করণীয় ছিল না। হয়তো ছিল না। কেন-না ঋত্বিকের মধ্যের সেই বাস্তবতা-অস্বীকারকারী শিশু তাঁকে হয়তো বয়স্ক মানুষের মতো সামগ্রিক দায়িত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা শেখায়নি, আর, তিনি মৃত্যু অবধারিত জেনে সেটিকে ত্বরান্বিত করেছিলেন এ কথা যখন শুনে চলি তখন মনে হয় লেখায় তার কোনো ছাপ নেই—শেষাবধি; আর, আমার ধারণা, মরে যাবেন এ তিনি কখনোই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেননি এবং শিশুর মতোই বিশ্বাস করেছেন যত যাই হোক, মরবেন না। বহু তথ্য

উদ্‌ঘাটনের পর হয়তো দেখা যাবে আমার কথায় মিথ্যা ছিল না। কিন্তু আগে যা বলেছি, শিশুর দায়িত্বহীনতায় নিজেকে শুধু খরচ করলে কখনও দুর্মর প্রাণময়তাও পরাজিত ও নিঃশেষিত হতে পারে। তাঁর ক্ষেত্রে হয়েছিল। যাঁর কয়েকটি লেখাই এতভাবে চিন্তাকে উদ্রিক্ত করে, তাঁর সকল স্বকৃত আচরণ সত্ত্বেও মনে হয় আমরা দরিদ্রতর হয়েছি এবং ফেব্রুয়ারির সেই রাতের জন্য কোনো না-কোনোদিন, কেউ-বা-কেউ আমাদের সময়কে সমগ্রভাবে অভিযুক্ত করবেন। সেটাই একমাত্র আমার কথা ঋত্বিক প্রসঙ্গে, আর সবই অপরিমেয় ক্ষতির বোধ।

দুটি কথা, এই বইয়ের পরিপূরক হিসেবে তাঁর অন্যান্য লেখা পড়লে তাঁকে বুঝতে পাঠকের সহায়তা হবে। আর উর্ধ্বকমার মধ্যে ব্যবহৃত ঋত্বিকের লেখাগুলির বানান যেমন দেখেছি ছাপার অক্ষরে, তেমনি রেখেছি।

সুরমা ঘটক

গ্রুপ থিয়েটার এবং 'সাঁকো'

ছোটোবেলায় বাড়িতে ছিল একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ। দাদা দিদি সবাই মিলে নাচ-গান অভিনয় করতেন। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের স্পর্শ ছিল পারিবারিক পরিবেশে। পিতৃদেবের শেষ কর্মস্থল ময়মনসিংহ থেকে কলকাতায় এসে ও পরে যুদ্ধ বাঁধার পর রাজশাহী গিয়ে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ছিল অভিনয়, সাহিত্যচর্চা, কবিতা লেখা।

এই সময় 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনি' ও 'পরিত্রাণ' নাটক করেছিলেন। দেশভাগের পর বহরমপুরে এসে বিএ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সেইসময় অতীন্দ্র মজুমদারের লেখা 'জাগরণ' নাটকে জিন্নার চরিত্রে অভিনয় করা উল্লেখযোগ্য। তারপর কলকাতায় এসে এমএ পড়াশোনার সঙ্গে চলছিল টিউশনি, অভিনয় এবং লেখালেখি।

আমি কলকাতায় আসার পরে সর্বাগ্রে যাদের নাম শুনতাম—উৎপল দত্ত, সলিল চৌধুরি, তাপস সেন, কালী ব্যানার্জি প্রভৃতি। এদের মধ্যে একটা নাম সর্বদাই শুনতাম—ঋত্বিক ঘটক। 'দলিল' ও 'বিসর্জন' আমি দেখেছিলাম 'ভাঙা বন্দর', 'অফিসার' প্রভৃতি সম্বন্ধে শুনেছিলাম দেখিনি। '৫৩ সালে গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় বম্বে সম্মেলনে 'দলিল' নাটকটি প্রথম পুরস্কার পায়। একটা ভিড়ের দৃশ্যে সমীরণ দত্তের অনুরোধে একটুখানি অভিনয় করে দিয়ে আসি। রোগা, লম্বা চেহারার মানুষটি আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে আসেন।

'৫৪ সালের প্রথমে বাবার কাছে কিছুদিন থেকে ফিরে এসে দেখি মামিমণিদের (সাধনা রায়চৌধুরি) বাসায় রোজই এসে উনি নাটক নিয়ে আলোচনা করছেন। উমানাথ ভট্টাচার্য তখন গোর্কির 'লোয়ার ডেপথস্'-এর অনুবাদ করেছিলেন 'নীচের মহল' নাম দিয়ে। গণনাট্য সংঘের তিনটি শাখার বাছাই করা ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাটকটির রিহার্সাল আরম্ভ হয়। আমাকেও একটি পার্ট দেন। সমাজের নীচুতলার মানুষদের নিয়ে লেখা নাটকটি সম্বন্ধে আমাকে একটি ভূমিকা লিখে দিতে বলেন। লিখে দিই—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সত্য ও বড়ো হল মানুষ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' আমার পড়াশোনার ও জানবার আগ্রহ বুঝে আমাকে স্তানিশ্লাভস্কির 'Group Acting' এবং গর্ডন চাইল্ডের বই কিনে (আর্কিয়োলজির ওপর) পড়াতে শুরু করেন।

তারপর ঋত্বিক ঘটকের বিরুদ্ধে ঝড় ওঠে, নাটকটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। নাটকটি মঞ্চস্থ হলে গণনাট্য সংঘের ইতিহাসে নামটি উজ্জ্বল হয়ে থাকত। আমি সাউথ স্কোয়াড থেকে ট্রান্সফার নিয়ে সেন্ট্রাল স্কোয়াড বা অনুশীলন সম্প্রদায়ে চলে এলাম। 'ইস্পাত' নাটকটির রিহার্সাল আরম্ভ হয়। একটি অন্য ছেলের লেখা নাটকের তিনটি দৃশ্য রি-রাইট করে, তিনটি দৃশ্য নিজে লিখে 'ইস্পাত' নামটিও নিজে দেন। আবার চার্জ। আমরা বেরিয়ে আসি এবং সেইদিনই প্রস্তাব করি—এই পার্টি ও গণনাট্য সংঘের চার্জ কোনো কাজ করতে দেবে না—সুতরাং সমস্ত ছেড়ে 'গ্রুপ থিয়েটার' নাম দিয়ে গ্রুপ গঠন করে নাটক করব।

২

'সাঁকো' নাটকটি লেখা আরম্ভ করার কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়। এক দাঙ্গার সময় সাগর এক মহসিনকে বাঁচিয়েছিল। পরবর্তী দাঙ্গায় মহসিনকে আর এক সাগর না-বুঝে ধরিয়ে দেয়। সাগর পূর্ববাংলা দেখেনি, ভাটিয়ালি গান শোনেনি। ছোটোবোন থাকত ঢাকায়, হঠাৎ লেটারবক্সে একটি চিঠি দেখে মাথাটা কীরকম হয়ে যায়। মহসিনের কাছে ভাটিয়ালি গান শুনে নিজে গাইছিল। সুরটা চড়িয়ে দেয়—গুন্ডারা সার্চ করতে এসে মহসিনকে ধরে নিয়ে যায়। নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হয়।

দ্বিতীয় অঙ্কতে—সাগর ও শংকর যায় সিংহাসন গ্রামে মহসিনের মা-বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে। আমি জবার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। নাটকের সংলাপ সব প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এক এক জায়গায় সেই সংলাপ যেন মঞ্চে কাব্য সৃষ্টি করত।

দ্বিতীয় প্রবাহ চতুর্থ দৃশ্য

মা—উজনি স্টিমারের ভোঁ পাইছস?

ফকির—কানে তো সেঁধায় নাই।

মা—এক-একদিন আবার ভোঁ মারে সেই সমশেরপুরের বাতিঘরের কাছে থিকা...(পাড়ে ওঠেন) বড়ো বাহার খুলছে তো! রোজ না দেখি, তবু নতুন ঠেকে।

ফকির—শ্বশুরের ভিটা যায়, ...মনে জাগে বউজান, তোমারে যেবার লাওএ কইরা লইয়া আসন হইল, জাফরানি রঙের আঁচলার টানা ছিল তোমার মস্তকে।

মা ও বাবার কথা হয় একমাত্র মেয়ে জবার সম্পর্কে—

মা—বুড়া মিয়া! দেশেরে চিনলা, কিন্তু দেশের মায়েরে চিনলা না। কথাটা কইয়া থুইলাম।

সাগর ও শংকর আসার পর—

সাগর—ওদিকটায় কী নদী?

বাবা—পদ্মা নদী।

সাগর—বড়ো অদ্ভুত জায়গায় বাড়িটা। ওগুলো কী ভাসছে? জ্বলছে?

বাবা—হিন্দুপাড়ার মেয়েরা বোধহয় ব্রত করে খোলার না ভাসিয়ে দিয়েছে।

সাগর—দূর থেকে একটা গান শোনাও যাচ্ছে যেন!

বাবা—ওই ব্রতকথা।

জবা আসার পর—

সাগর—বড়ো অদ্ভুত জায়গায় বাড়িটা, ঠিক নদীর ওপরে। স্বপ্ন স্বপ্ন লাগছে...অন্ধকার, অন্ধকার ছেয়ে রয়েছে আর তার মধ্যে—নদীর স্রোতের চাপা শব্দ...সেই কবে দেখা মহসিন, আজ তার বোন। শংকর উঠে পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ব্রতকথার একটানা সুরটা বেড়ে ওঠে, একসঙ্গে বহু মেয়ের গলায় বিচিত্র কথা জড়ানো সুর।...

সাগর—আমার দেশ!...কী শক্তি...আর কী শান্তি।

সাগর ও শংকর চলে গেলে।

জবা আস্তে করে পাড়টাতে গিয়ে দাঁড়ায়। পদ্মার জলোচ্ছ্বাস বেড়ে ওঠে, নারীকণ্ঠে গানের অনুরণনটা চলছেই...মুখ ওর অদ্ভুত প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জবা—আমার দেশ! কী শক্তি! কী শক্তি!

একটা ঘুরপাক খেয়ে ও ছুটে চলে গেল ভেতরে।

জলোচ্ছ্বাসটা চলছেই...।

নাটক চলাকালীন মনে হত যেন পদ্মানদীর পাড় দেখতে পাচ্ছি। ব্রতকথা ও জলোচ্ছ্বাস শুনতে পাচ্ছি।

৩

পঞ্চম দৃশ্য

সাগর—চড়া থেকে গাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, উৎসবের উদ্দামে উত্তাল গাঁ। এটাই কি স্বাভাবিক জীবন?

জবা—স্বাভাবিক জীবন আমাদের দুঃখদুর্দশায় জর্জর। বিশেষ অবস্থার জন্য এমন লাগছে।

সাগর—বিশেষ অবস্থা?

জবা—হ্যাঁ, যুক্তফ্রন্টের জয়। সারা পূর্ববংলা একটা রাজনৈতিক জাগরণের সম্মুখীন। বাংলাদেশকে হঠাৎ কেন জানি আমরা পাগলের মতো ভালোবাসছি।...দেশের মাটির জন্যে জান কবুল আছে আমার।...আমার পাশের সাথি মরেছে ঢাকার পথে ওদের গুলিতে। 'বিরানব্বই' ধারা জারি হলেই জবাকে চলে যেতে হবে মাটির তলায়।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সাঁঝ ঘনিয়ে এসে গেছে। বড়ো মন্থর অবকাশ একটা। ফকির তার অভ্যস্ত জায়গাটিতে তুরীয় ধ্যানে মগ্ন। টিমটিমে জ্বলা লণ্ঠনটার পাশে বসে মা একটা নক্‌শিকাঁথা সেলাই করে চলেছেন। খানিক দূরে খাটিয়াতে বসে দুলে দুলে জবা একটা বই পড়ছে।

সমস্ত দৃশ্যটিতে গড়ে উঠেছিল একটা ছন্দ, শান্ত, সুন্দর।

শেষপর্যন্ত মায়ের অনুরোধে সাগর আস্তে আস্তে গাইতে আরম্ভ করে...নাইয়া ভাই, সুজন নাইয়া। সাগর গায় তার পঞ্চমে। যেখানে বহুদিন আগে মহসিন থেমেছিল, সেইখানটাতে পৌঁছে হঠাৎ থেমে যায়। দু-চোখ তার উদ্‌ভ্রান্ত।...

সাগর—এ গান শেষ হয় না। বুকের মধ্যে কী হচ্ছে আমার। পাড় ধরে ও ছুটে নেমে যায়।

মা—দুনিয়ারে আজও চিনলাম না।...হাতের মুঠায় সুখ আসে, আবার পলাইয়া যায়। এই বাত্তি জ্বইলা ওঠে, এই বাত্তি নিভা যায়। ...হদিশ মিলে না।

শেষ পর্যন্ত সাগর জবাকে সব বলে।

সাগর—শেষ অবধি এখানে এসেছি প্রায়শ্চিত্ত করতে।...

জবা—...হঠাৎ একটা আচমকা কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। জীবনটা বহতা নদী, তার চর-জাগা ধরা পড়ে হঠাৎ, পলি পড়ে বহুকাল ধরে।

সাগর—এত কষ্ট তুমি চেপে ছিলে কীসের জোরে?

জবা—ভালোবাসার জোরে।...জীবিতদের প্রতি ভালোবাসার জোরে।

৪

মিলিটারি শাসন মানে—অপরিসীম অত্যাচার। মন্ত্রীসভা ভেঙে গিয়েছে। যুক্তফ্রন্টের কর্মীরা সারা দেশময় গা ঢাকা দিচ্ছে।

জবাকে জলে যেতে হবে, সাগরও যাবে সঙ্গে।

মা—সাগর, তোর গান শুনা হইব না আর রে!...

সাগর—নৌকায় নেমে ধরছি, গলা ছেড়ে।

মা—বাতাসে পানির সোয়াদ, বৃষ্টি নামব রে।

সাগর গানটা ধরে, গানের টান উদাত্ত গলায় ভেসে আসতে থাকে।—

নাইয়া ভাই!
চক্রপথে ঘুইরা মোর মন রইল যে উদাস—
বাতাস তবু আভাসে দেয় নতুন ভোরের বাস।
ব্যথায় আমার বুক যে ভাঙে আশা ভাঙে না।
সাথে আছে হাজার মানুষ, তুফান ডরি না।

হঠাৎ আকাশটাকে সাদা করে দিয়ে বিদ্যুৎ চাবুক হেনে গেল একবার আকাশ জুড়ে গুরগুরানি। গানটা শতকণ্ঠে ধরে নিয়েছে এখন কারা। শেষ কলিটা আছড়ে পড়তে থাকে জোয়ারের মতো মঞ্চময়।

নাটকের বিষয়বস্তু ও সংলাপ সবাইকে মুগ্ধ করে। নাটকটি 'গ্রুপ থিয়েটার'-এর পক্ষ থেকে '৫৫ সালের প্রথমে রঙমহলে অভিনীত হয়েছিল।

বম্বে থেকে ফিরে আসার পর '৫৮ সালের ২২-শে এপ্রিল, সন্ধ্যা ৭-টায় বিশ্বরূপাতে আবার দ্বিতীয়বার 'সাঁকো' মঞ্চস্থ হয়।

৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র' নামে ছোটো গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটি গ্রুপ থিয়েটার থেকেই মঞ্চস্থ করা হয়।

গ্রুপ থিয়েটার থেকে যে 'বিদ্যাসাগর' নাটকটি করার কথা ছিল ও রিহার্সাল আরম্ভ হয়েছিল। তাতে চরিত্রায়ণে ছিলেন—

বিদ্যাসাগর : জ্ঞানেশ এবং বুলবুল (সতীন্দ্র), মতিলাল : অনিল, বাচস্পতি : অমলেশ চ্যাটার্জি, ভূদেব : দ্বিজু ভাওয়াল, দুর্গাচরণ : উমানাথ ভট্টাচার্য, শ্রীরাম : শৈলেন ঘোষ, রাজকৃষ্ণ : সমীরণ দত্ত, কৃষ্ণমোহন : ঋত্বিক ঘটক, শ্রীশ ঃ বাবু।

গ্রুপ থিয়েটারে আরও ছিলেন উমাপ্রসাদ মৈত্র, সনৎ দত্ত, সুরমা ঘটক ও ভূপতি নন্দী। ১৯৬৩ সাল, স্তানিস্লাভস্কির জন্মশতবার্ষিকী উৎসব। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ঠিক করলেন মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের জীবনী অভিনয় করবেন আর-এক মহাপুরুষের জন্মশত-বার্ষিকীতে। প্রান্তিকের তরফ থেকে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

কর্মব্যস্ততার জন্য গ্রুপ থিয়েটার নাটকটি মঞ্চস্থ করতে পারেনি।

গ্রুপ থিয়েটার ব্যানারে শ্রীযুক্তা গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে নাটক করে গেছেন। এই ব্যানারে আমাদের আর নাটক করা হয়নি।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

গণনাট্যসংঘের একটা যুগ ও ঋত্বিক

গণনাট্যসংঘের একটা বিরাট যুগ আছে। তামাম দুনিয়ায় চল্লিশের কোঠায় স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যে মরণপণ লড়াই চলেছিল তার ঢেউ আছড়ে পড়ে এই ভারতবর্ষের মাটিতে। শ্রমিক কৃষক ছাত্র মহিলা সংগঠনের কর্মীশিল্পীরা এদেশের স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তিমান হাতিয়ার হিসেবে সচেতনভাবে সংগঠিত করেন গণনাট্য আন্দোলন। শোষণহীন সমাজপ্রতিষ্ঠা তার স্বপ্ন। গণনাট্যকর্মীরা আকাশচুম্বী সৌধশিখরে বসে জনগণকে দেখতে শেখেননি। তাঁরা গণসংগ্রামের গভীরে থেকে নির্যাতিত লড়াকু মানুষের স্বপক্ষে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। গণনাট্যের নায়ক আশাবাদী সংগ্রামী খেটে-খাওয়াদের প্রতিনিধি। তার কারবার লক্ষ কোটি জনতার আমদরবারে। গণনাট্য গণআন্দোলনের মশাল, সে মশালের আলোয় শ্রেণিসংগ্রাম এবং শ্রমিক আন্তর্জাতিকতা ভাস্বর হয়ে ওঠে।

এই চিন্তাধারা, স্বপ্ন ও দৃঢ়মনোভাব নিয়ে আমরা সেই যুগের গণনাট্যসংঘের শিল্পীরা গণসংগীত, নৃত্যনাট্য ও গণনাট্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তার জন্যে খাটতে হয়েছে দিনের পর দিন। রাতের পর রাত-- প্রধান অপ্রধান সকল শিল্পীকেই। পার্টির আইনি ও বেআইনি দুটো যুগেই আমরা কাজ করেছি। বেআইনি যুগে আমরা লুকিয়ে নাটক করে পালিয়ে যেতাম। যেমন সলিল চৌধুরীর 'সংকেত' নাটকটি। পুলিশ আমাদের ধরতে পারত না। তবুও প্রেসিডেন্সি জেল ভর্তি হয়ে উঠেছে। জেলের মধ্যে গুলি চলেছে। কিন্তু আমাদের সংগীত ও নাটক বন্ধ হয়নি। আমরা স্বপ্ন দেখতাম লালফৌজ এসে গেছে। আমি অভিনেতা, তাই নাটকের কথাই বেশি মনে পড়ে। নাট্যচক্র ছিল একটা গ্রুপ। এর মধ্যে নাট্য আন্দোলনের দিকটা দিগিনদা (দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়) দেখতেন। 'নীলদর্পণ' নাটকটি ওই সময় উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হলাম। এই অন্তর্ভুক্তিতে ভূপতি নন্দী আর সাধনা আমাকে খুব সাহায্য করল। আমার নাম রেকমেন্ড করেছিলেন জ্যোতি বসু।

সব দেশ স্বাধীন হয়েছে। পার্টি বলেছে—এ আজাদি ঝুটা হ্যায়, এ স্বাধীনতা সত্যি স্বাধীনতা নয়। দলে দলে মানুষ জেলে যাচ্ছে, অনশন করছে আমরণ। আইপিটিএ-এর

কাঁধে তখন অগাধ দায়িত্ব—সংগঠনকে আরও অনেক-অনেক বাড়াতে হবে, যাতে করে প্রতিটি মানুষের কাছে আমাদের বক্তব্যকে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়।...

আমাদের একাগ্রতার আন্দোলন চলছে। 'কমিনফর্ম'-এর কাগজ 'লাস্টিং পিস'-এর কিছু লেখার পড়ে হঠাৎ প্রথম আমাদের গভীর বিশ্বাস নাড়া খেল। তার আঘাত এসে পড়ল আন্দোলনের ওপরেও। তখন আকাশের রং, বাতাসের গন্ধ, মানুষের চেহারা সব-কিছুই ছিল আলাদা। চারিদিকে বিচ্ছিন্নতা, মনের মধ্যে অনিশ্চয়তা—একটা থমথমে ভাব। মনে হচ্ছে আবার নতুন করে সবকিছু ভাবা দরকার। এই সময়ে আমার কাছাকাছি সঙ্গী ছিলেন পানু পাল, তাপস সেন, বীরেন মুখার্জি, অনিল ঘোষ, অজয় ব্যানার্জি, সুব্রত সেন, করুণা, সাধনা, রেবা এঁরা। সাংগঠনিক চিন্তাধারা তখন নতুন পথে বাঁক নিয়েছে; মনে হচ্ছে প্রাত্যহিক সংগ্রামের নাটক ছেড়ে দীর্ঘস্থায়ী পথে যেতে হবে—আর তারই জন্য প্রয়োজন পুরোনো ট্র্যাডিশনে ফিরে যাওয়া—সঠিক নাট্যরীতি শিক্ষা আর গবেষণার জন্য নাট্য আকাদেমি প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। সেখানে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষিত নাট্যকর্মী গড়ে উঠতে পারবে। নির্মল আর আমার মাথায় যখন এইসব পরিকল্পনা ঘুরছে, সেই সময়েই সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ কফি হাউসে রমেন, প্রভাস, আর উৎপলের সঙ্গে আলাপ। ওরা তখন বাংলায় শেকসপিয়র করছে। উৎপল এল সংগঠনে, নতুন নাটক করলাম—রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'। এই নাটক নির্বাচনের পিছনে পথ পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল। ঋত্বিক করল রঘুপতি, আমি জয়সিংহ, শোভা সেন গুণবতী, নক্ষত্র রায় মমতাজ আহমেদ, অপর্ণা গীতা সেন। পরে নিবেদিতা দাসও অপর্ণার চরিত্রে অভিনয় করেছে। উৎপলই প্রথম 'বিসর্জন' পরিচালনা করে। পরে ঋত্বিক এই নাটক হাতে নিয়ে বেশ-কিছু পরিবর্তন এনেছিল। সেটে একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে, ওপরে একটা গুহার মুখ। ঋত্বিক চরিত্রগুলোকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গুহার খোলা মুখ দিয়ে যাওয়া-আসা করিয়ে ওপরের ফাঁকে খোলা আকাশ, সেখানে সূর্যের প্রদক্ষিণ দেখা যাচ্ছে। 'বিসর্জন' আমাদের সাফল্য এনে দিয়েছিল।

পানু লিখল 'ভাঙা বন্দর'। অভিনয় হবে, কিন্তু মহিলা শিল্পীর অভাব। 'বাস্তুভিটায়' প্রীতি লাহিড়ি নামে এক মহিলা অভিনয় করেছিলেন, তাঁকে আনার জন্য আমি, পানু, উৎপল, নির্মল আর ঋত্বিক গেলাম দেখা করতে। আপত্তি সত্ত্বেও রাজি হল। এই মহিলাই পরবর্তীকালে আমার স্ত্রী হল।

কাজ চলছে। ঋত্বিক লিখল, 'দলিল'। 'দলিল' মঞ্চস্থ হল। এদিকে আমাদের আকাদেমি প্রস্তুতের কাজকর্ম এগোচ্ছে। 'মস্কো আর্ট থিয়েটার' থেকে কোর্সের কাগজপত্র আনালাম। উৎপলের বাড়িতে স্টাডি সার্কল বসল। অধ্যাপক নীরেন রায় শেকসপিয়র অনুবাদ করলেন।

'ভাঙা বন্দর'-এর সময় থেকেই আমাদের সামনে দারুণ অর্থাভাব। আমি আন্দোলনে হোলটাইমার বলে আমার নিজের আর্থিক সমস্যাও রয়েছে। কারণ বয়স বাড়ছে, বাঁচার জন্য কাজের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ও আন্দোলনের সংকট একই সঙ্গে জড়িয়ে গেল। '৫১-তে জীবনের জটিল জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। সংগঠনে প্রস্তাব দিলাম এভাবে

দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালানো যাবে না। আন্দোলনকারীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের প্রয়োজন। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করল অনেকেই। আজ বুঝি, ওঁরা কেউ নাটককে পেশা করতে চায়নি, তাই এই বিরোধ। যাই হোক, আমি ওদের বোঝাবাব চেষ্টা করেছিলাম— কোনো কাজের মধ্য দিয়ে যা প্রস্তুত হচ্ছে তা বিক্রি করে সংগঠনের শ্রমিকদের যদি বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া না যায়, তবে সে কেমন কাজ। ওরা বুঝল না। সমস্ত মন ভেঙে গেল আমার। পার্টির কাজ করছি, কিন্তু বুঝছি শিল্পী হিসেবে বাঁচতে হবে আমাকে। পার্টিও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকায়, নিশ্চিত নয়। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করি। আমরা 'বিসর্জন' করতে গিয়ে দেখি সন্ধেবেলা সব মদ খেয়ে লণ্ঠন হাতে নাটক দেখতে এসেছে। নাটক শুরুর একটু পরেই হইচই, তাদের ভালো লাগছে না। অবশেষে দর্শকদের মধ্যে চিৎকার 'মেয়েটারে নাচায়ে নাও' অর্থাৎ অপর্ণাকে নাচতে হবে। নাচ-গান ছাড়া অভিনয় তাঁদের ভালো লাগছে না। অবশেষে পানু গায়ে রং মেখে মঞ্চে এসে নাচল—'দুর্ভিক্ষ নৃত্য'। তারপর কোনোরকমে অভিনয় শেষ করে তাড়াতাড়ি পালালাম আমরা। জানা গেল পার্টির তরফে ওখানে বলা হয়েছিল আইপিটিএ যাত্রা দেখাতে আসছে। পার্টির প্রধান শক্তিশালী পক্ষের আইপিটিএ-র প্রতি এই ছিল মনোভাব....

ঋত্বিক ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী, ঋত্বিকের ছবি দেখার চোখও ছিল অসাধারণ। ক্যামেরাকে সবসময় প্রায় স্টেনগানের মতো ধরে রাখত ও।...

...ঋত্বিকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা শুধু আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নয়— কাজের মধ্য দিয়ে আদর্শের মধ্য দিয়ে। পরে সে বন্ধুত্ব আমাদের আরও ঘনীভূত হয়; কারণ আমি দেখেছি, জীবনে আমি যা বিশ্বাস করি ঋত্বিকও তেমনভাবে জীবনকে ভালোবাসে। তার কাজে জীবনই হচ্ছে ভিত্তি এবং কাজের মাধ্যমে, নাটক ও ফিল্‌মের মাধ্যমে তাকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা করা, সৃষ্টি করা হচ্ছে মূল লক্ষ্য। ...

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল জীবনকে জানা, জীবনের গভীরতম প্রদেশ থেকে জানা। সেইজন্য, কৃষকই বলুন, মজদুরই বলুন, মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মানুষই বলুন তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া আমাদের কর্তব্য বলে আমরা মনে করতুম। তাদের কথা, ভাষা, চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে জানতে না পারলে, সত্য কী তা তো আমরা জানতে পারব না এবং অভিনেতা হিসাবে আমি এটা অনুভব করতাম যে তাকে রূপ দেওয়াও সম্ভব নয়। এইজন্যই মূলত রাজনৈতিক পটভূমিকায় এতটা সক্রিয় থাকতে হত আমাদের। আমার মনে পড়ে মেটিয়াবুরুজের সাত-আটটা ফ্যাক্টরির মজদুরদের কাছে আমরা নিয়মিত যাতায়াত করতাম এবং তাদের জীবনের ওপর নাটক লেখবার চেষ্টাও হত। মিছিলে চলতে চলতে, তাদের গেট মিটিংয়ে, সভায় দাঁড়িয়ে, একই সঙ্গে বসে তাদের জীবনকে জানবার জন্য আলোচনা হত। এবং ঋত্বিককে দেখেছি সেখানে থেকেই গল্প বা প্লট বার করে নিয়ে আসতে। 'নাগরিক'-এর সৃষ্টিও সেইভাবেই হয়েছে। এখানে আকাদেমি তো ছিল না—আমাদের আকাদেমি ছিল সাধারণ মানুষের জীবন। আমি প্রফেশনাল থিয়েটার স্টারে ছিলাম ১৯৫৪ থেকে, তারও আগে শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে। সেইসময় অন্যান্য পরিচালক, নাট্যকারদের আমরা দেখেছি—তাঁদের কারও মধ্যে জীবনকে জানবার জন্য এই যে তৃষ্ণা,

এই যে সৎপ্রবৃত্তি, সৎ মন, নিষ্ঠা এটা কখনও দেখিনি। তাঁরা সাজানো জীবনকে নাটকের মধ্যে বারবার এনেছেন এবং তাঁদের মতো করে জীবনকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ঋত্বিক জীবনকে দেখেছিল মিছিলে চলতে চলতে। Romantic point of view থেকে জীবনকে না দেখে সে অনেক গভীরে গিয়ে 'নাগরিক' ছবির কাহিনি তৈরি করল, ছবি তৈরি হল। সেই ছবিতে আমরা দেখেছি, মানুষ তার জীবনকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য কেমন করে সক্রিয় হয়েছে; সে মাঠে নেমেছে, সে রাস্তায় নেমেছে, মিছিলে এসেছে, এবং জীবনকে সংঘবদ্ধ করবার সংকল্প গ্রহণ করেছে। ছবির মধ্যে ঋত্বিকই প্রথম এটা এনেছে।

IPTA-এর South Group হয় প্রথম। Central Group reorganise করার সময়ে ছিল ঋত্বিক। ওই periodটা ছিল propaganda-র যুগ। ঋত্বিকের 'দলিল' নাটকটি উল্লেখযোগ্য। তারপর আসে থিয়েটার শেখার ব্যাপার। Constant practice ও Academic পড়াশোনা। অনেক শিখতে হবে, জানতে হবে, পড়তে হবে। এই ব্যাপারে initiative নিয়েছিল ঋত্বিক ও উৎপল। উৎপলের বাড়িতে অধ্যাপক নীরেন রায় আমাদের ক্লাস নিতেন। পরে ক্লাস করার অসুবিধা হয়েছিল, কারণটা মনে নেই। কিন্তু নিজেদের মধ্যে আমরা theoretical discussion করতাম। হাজরা রোডে, রেস্তোরাঁয় ছিল আমাদের আলোচনা স্থল। Academic পড়াশোনা ও চিন্তার ব্যাপারে ঋত্বিকের contribution ছিল প্রচুর। এরপরে আমরা individual পড়াশোনা করতাম।

ইতিমধ্যে নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে বিজনদার 'নবান্ন' সাড়া জাগিয়েছে। তারই মধ্য দিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে এসে আমাদের বক্তব্য বলবার জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে স্থির করলাম। ছবি করার আগে আমরা আমাদের মনকে সক্রিয় করি, সংঘবদ্ধ করি এই ভারতীয় গণনাট্য সংঘে এসে। ঋত্বিক অবশ্য প্রথম দিকে খুব সক্রিয় ছিল না। ও ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিয়ে পড়ছে; তার তখন ইচ্ছে একটা ছবি করে—একটা ছবিতে ও তখন কাজও করেছে, সেটা অবশ্য ডকুমেন্টারি পর্যায়ে থেকে যায়। গণনাট্যে এসে ও একটা নাটক লিখল 'দলিল', ওই পার্টিশন, ওই ভঙ্গবঙ্গের ওপর। এই নাটক লেখার মধ্যে ওই যে ওর সাংঘাতিকভাবে সংবেদনশীল যে-মন সেটার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ওই নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়েই আমাদের আরও ঘনিষ্ঠতা হল।...

আমি professional লাইন থেকেই গিয়েছিলাম গণনাট্য আন্দোলনে— আবার যখন professional লাইনে ফিরে আসি বা আসতে বাধ্য হই (আর্থিক কারণে) তখনও মনে জ্বালা ছিল—গণনাট্য আন্দোলন করতে পারছি না। কখনও এগিয়ে গেছি বিজনবাবুর নাটক করতে, কখনও এগিয়ে গেছি ঋত্বিক যাতে সুস্থ হয়ে 'দলিল' নাটকটি করে। মৃত্যুর পরেও ওর স্ত্রীর কাছে গেছি 'দলিল' নাটকটি করব এবং রেকর্ড রাখবার জন্য 'দলিল' সিনেমাও কবব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। গণনাট্যসংঘের ওই একটি যুগ আমাদের মনকে উদ্‌বেলিত করে—আমরা তো গণনাট্য আন্দোলন আন্তরিকভাবেই করতে চেয়েছিলাম।

যে-যৌথ প্রচেষ্টা, যৌথ জীবন ছিল আমাদের মধ্যে তা আজকের যুগে ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না। ঋত্বিকের কথা বলতে গিয়ে বারবার ওই যুগটাকে স্মরণ করি—আমরা সবাই মিলে একটা চেষ্টা করেছিলাম।

অভি ভট্টাচার্য

সুবর্ণরেখার স্মৃতি

এক দীর্ঘ সময় চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত থেকেও, আজ সর্বকিছুকে আর পরিষ্কার করে মনে পড়ে না। তবে প্রতিটি মানুষের জীবনেই এমন অনেক ঘটনা থাকে, ব্যক্তি থাকে যার কথা স্মৃতির ভিড়ে হারিয়ে যায় না। ফিরে আসে। ফিরে ফিরে আসে। আমার জীবনে ঋত্বিক সেইরকমই এক ব্যক্তি।

বর্তমান বাংলাদেশের, পাবনা জেলায় ঋত্বিকের জন্ম। আমারও ওই একই গ্রামে বাড়ি। বয়সে আমার থেকে ঋত্বিক ছোটো হলেও ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। পরে দুজনেই রাজশাহী কলেজে পড়ার ফলে, সেই বন্ধুত্ব ক্রমে আরও ঘনিষ্ঠ হয়। ওই সময়ে ঋত্বিকের বাবাও ছিলেন রাজশাহীতে। সাহিত্যিক মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ছিলেন ঋত্বিকের আপন ভাইঝি।

১৯৬০ সালে এক হিন্দি ছবি পরিচালনার জন্য ঋত্বিক বোম্বাইতে আসে। তবে সেই ছবি শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি। ওইসময় ওখানে আমার এক বন্ধু থাকত। নাম, রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা। বোম্বাইতে থাকলেও রাধেশ্যাম ছিল কলকাতারই ছেলে। ঋত্বিকের সঙ্গে রাধেশ্যামের পরিচয় হয়। আমার এই বোম্বের বাড়িতে বসেই ঠিক হয় ঋত্বিক ও রাধেশ্যাম ছবি করবে। ছবির নাম সুবর্ণরেখা। মূল কাহিনিটা ছিল রাধেশ্যামেরই লেখা। কিন্তু ছবি তো হবে! পয়সা কই!.

কলকাতায় রাধেশ্যামের একটা ফ্ল্যাট ছিল। ওই ফ্ল্যাটের একটা অংশ বিক্রি করে রাধেশ্যাম ছবি শুরু করল। ছবি হবে কলকাতায়। আমি হলাম ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্র। আর মাধবী মুখার্জি হয়েছিলেন আমার বোন। তখনও মাধবী এত নাম করেনি। আমরা প্রায় বিনা পয়সাতেই অভিনয় করেছিলাম। কারণ, পয়সাকড়ির স্বচ্ছলতা মোটেই ছিল না। যাই হোক, বহু পরিশ্রম করে, বহু কষ্টে ছবি শেষ হল। ছবির ডিস্ট্রিবিউশন হল না। এদিকে বাজারে বিস্তর ধারদেনা হয়ে গেছে। তখন ওই ধারদেনা শোধ করার জন্য রাধেশ্যাম বোম্বাই-এর বিখ্যাত ফিল্ম্ ডিস্ট্রিবিউটর রাজশ্রী পিকচার্সকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকায় ছবি বিক্রি করে দেয়।

রাজশ্রী প্রোডাকশনের ব্যানারে ছবি রিলিজ হল। তবে চলল না। পরে অবশ্য চলেছিল। আসলে এসব ছিল 'সময়ের' থেকে অনেক এগিয়ে থাকা। অবশ্য সত্যজিৎবাবুও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

সত্যজিৎ রায় ছিলেন ঋত্বিকের বিশেষ পরিচিত। সুবর্ণরেখায় মাধবীর অভিনয় দেখে উনি বলেছিলেন, "ঋত্বিকের কাস্টিং সেন্স অসাধারণ।" সুবর্ণরেখা দেখেই সত্যজিৎবাবু মাধবীকে ওনার 'চারুলতা'-র জন্য নির্বাচন করেন।

ফ্রান্সের বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক জর্জ সাঁদুল তখন ফ্রান্স ও ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। মনে আছে, জর্জ সাঁদুল কলকাতায় ঋত্বিকের ছবিগুলো দেখেন। আর ফ্রান্সে গিয়ে ঋত্বিককে পাঠান এক দীর্ঘ চিঠি। সেই চিঠি ঋত্বিক আমাকে দেখায়। চিঠিটা এখন খুঁজে পেলাম না। কিন্তু পরিষ্কার মনে আছে, তাতে লেখা ছিল, "ইয়োর পিক্চার ইজ মোর আর্টিস্টিক দ্যান রে'স চারুলতা"। ভারত সরকার ঋত্বিকের সব ছবিকেই 'আন্অফিসিয়াল এনট্রি ফর ফেস্টিভ্যাল' এবং সাবটাইটেল ছাড়া পাঠাত। ফলে ঋত্বিকের ছবি রেকগনাইজড হতে পারত না। সাঁদুল আবার লিখলেন—'সেনড্ ইয়োর পিকচার অ্যাজ অফিসিয়াল এনট্রি।' রাজশ্রী পিকচার্সকে চিঠির কথা জানালে তারা ছবিটা উৎসবের জন্য কিছুটা দৈর্ঘ্য কমিয়ে প্রিন্ট করে। তৎকালীন ভারত সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রকের প্রধানকে ঋত্বিকের 'সুবর্ণরেখা'-র কথা জানালে তিনি অফিসিয়াল এনট্রির জন্য রাজি হন এবং সেই ব্যাপারে একটা চিঠি দিতে বলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য! আমাদের ছবি যখন ভেনিস ফেস্টিভ্যালের জন্য প্রস্তুত হল, ততদিনে মিনিস্ট্রি বদলে গেছে। ছবি আর পাঠানো সম্ভব হল না।

প্রবাসী বাঙালিদেরকেও এই ছবি ভীষণভাবে ধাক্কা দিয়েছিল। এই ছবি দেখে তাঁদের আবেগ, উচ্ছাস আর মন্তব্য আজও পরিষ্কার মনে পড়ে। বেশ কিছু প্রবাসী বাঙালি আমায় বলেছিল—"দাদা! বহু সিনেমাই দেখেছি, কিন্তু এভাবে কোনোদিন প্রহৃত হইনি।" বোম্বাই-এর এক বিখ্যাত অবাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক ছবি দেখে হলের বাইরে এসে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন। আর আমার দু-হাত জড়িয়ে ধরে জানান আন্তরিক ধন্যবাদ। অবশ্যই ঋত্বিককে।

জীবনের খানিকটা সময় ঋত্বিক পুনের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্স্টিটিউট-এ শিক্ষকতা করেছিল। ওখানকার ছেলেরা, ঋত্বিকের ছাত্ররা তাদের শিক্ষাগুরুর কাছে যে কী ভীষণভাবে ঋণী, তা ওদের সঙ্গে কথা বলেই বুঝেছি।

আমার এই বাড়িতে ঋত্বিক অনেকদিন কাটিয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই দিন ও রাত, ছবিই ছিল ওর সবকিছু। ধ্যান, জ্ঞান ও স্বপ্ন। নিদারুণ আঘাত, বিষণ্ণতা ও হতাশা সত্ত্বেও ঋত্বিক একের পর এক ছবি বানিয়ে যাচ্ছিল। শুধুমাত্র ওর স্বপ্নের তাগিদে। বোধহয় মদই ওর মৃত্যুর কারণ। হয়তো না।

'সুবর্ণরেখা'-র শেষ দৃশ্যে প্রায় এক কথাতেই ঋত্বিক—আমার কী অনুভূতি হবে, তা বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমিও ঋত্বিকের সেই নির্দেশ যথাসম্ভব পালন করার চেষ্টা করেছি। যাই হোক, ওর দক্ষ ক্যামেরায় সে দৃশ্য বাস্তবায়িত হয়েছিল।

ঋত্বিক ছিলেন একজন সত্যিকারের সৎ শিল্পী। এক সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ।

জ্যোতির্ময় বসুরায়

ঋত্বিক ঘটকের ছবি

এই দেশের কোনো চলচ্চিত্রকারকে যদি নিঃসঙ্গ আখ্যা দেওয়া যায় তবে তিনি শ্রীঋত্বিককুমার ঘটক। এই একজন ভদ্রলোক যিনি কখনও কারও মুখের দিকে তাকিয়ে ছবি করেননি। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবেও না। তাঁর মুখের দিকে কোনো কোনো সাহসী প্রযোজক কয়েকবার তাকিয়েছেন—তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ—ফলে গত দশ বছরে আমরা পাঁচখানি পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। শ্রীঘটকের প্রথম ছবি 'নাগরিক' কীসব যেন ব্যাবসায়িক গোলযোগের জন্য আদৌ মুক্তি পায়নি। সেটি 'পথের পাঁচালী'র আগে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আরও একাধিক ছবির ভাগ্যবৃত্তান্ত প্রস্তাব আর সংক্ষিপ্ত প্রস্তুতিপর্বের মধ্যে নিঃশেষিত। অতএব পাঁচখানি কাহিনিচিত্রের পরিচালক হিসাবে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় সিনেমার রেকর্ড বইতে তাঁর নাম। তবে পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে থাকতে একটি অল্পদৈর্ঘ্যের ছবি করবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল—সেটি ধরলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে পাঁচ।

শ্রীঘটকের প্রথম প্রদর্শিত চিত্র 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮) মুক্তি পাওয়ার পরেই ছবিটির প্রযোজক মহাশয় সমালোচকদের নিয়ে ছোটো একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। উদ্দেশ্য : পরিচালকের সঙ্গে সমালোচকদের আলাপ করিয়ে দেওয়া। সাংবাদিকদের সেখানে প্রশ্ন করবার সুযোগও ছিল। অন্তত, তাঁরা তাই করেছিলেন। 'অযান্ত্রিক' যে নতুন ধরনের এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র এ বিষয়ে কারও মনে সন্দেহ ছিল না। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' এবং 'পরশ-পাথর' দেখবার পরেও এই ছবি দেখে সকলেই চমকিত। নতুন পরিচালকের বলিষ্ঠ এবং একেবারে স্বতন্ত্র স্টাইলে মুগ্ধ বিস্মিত হয়েও কেউ কেউ সাধারণ চিত্রামোদীর দিক থেকে ব্যাপারটা মনে মনে বিচার করছিলেন। জনৈক প্রবীণ সমালোচক ঋত্বিকবাবুকে প্রশ্ন করেন : "আপনি ছবিটা কাদের জন্য করেছেন?" পরিচালক কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকলেন, তারপর বললেন : "আমার জন্যে।" বলে নিজের বুকের ওপর তর্জনিটা বার দুই ঠুকলেন। এক মুহূর্ত পরে সে আঙুলটাই প্রশ্নকর্তার দিকে ফিরিয়ে দিয়ে যোগ করলেন—"আর আপনার জন্যেও।'

এর পর আর প্রশ্নোত্তর বেশিদূর অগ্রসর হয়নি।

হ্যাঁ, এই হচ্ছেন ঋত্বিক ঘটক—আত্মপ্রত্যয়ে স্থির, সেইসঙ্গে বেপরোয়া। শিল্পীজনোচিত অহমিকা থাকলেও নিজেকে যে তিনি সতত অভ্রান্ত মনে করেছেন এমন নয়। দ্বিতীয় চিত্র 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র (১৯৫৯) প্রথম প্রদর্শনীর পর তাঁকে কতকটা বিষণ্ণ মনে হয়েছিল। ছবিটি আমন্ত্রিত দর্শকদের মুগ্ধ করেনি। ওই চিত্রে এক কিশোর চরিত্রের চোখ দিয়ে কলকাতার ধনী-দরিদ্রের অসাম্য আর গ্লানির ছবি দেখানো হয়েছে। বয়স্ক এবং বিশেষ ধরনের জীবনচেতনায় উদ্দীপ্ত পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি এই চরিত্রে আরোপিত। পরিণত মনের অধিকারী কিশোর চঞ্চলকে দর্শক মেনে নিতে পারবেন কি না এই প্রশ্নে অনেকেরই মনে এসেছিল। পরিচালক সেদিন কথায় কথায় বলেন : "দর্শক যদি রসগ্রহণ করতে না পারেন, তবে বুঝব সেটা আমারই অক্ষমতা। ছবি যখন তার ভাববস্তুর মধ্যে দর্শকের চিত্তকে আপ্লুত করতে বিফল হয়, তখন সে-বিফলতা পরিচালকেরই।"

এই 'বিফলতা' বারে বারেই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। দর্শককে তিনি অশ্রদ্ধা করেননি; তবু ছবি করবার সময় টিকিটঘরের চাহিদার কথা ভেবেছেন এমন দৃষ্টান্ত দেখি না।

শ্রীঘটকের পাঁচখানি ছবির মধ্যে একমাত্র 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০) মোটমুটি চলেছিল। ছবিটি প্রযোজককে লাভের টাকা না-দিলেও সম্ভবত লোকসান ঘটায়নি। অন্তত বেশ কিছু দর্শক ছবিটি দেখেছিলেন। বাকি চারখানি ছবি সম্পর্কে তা-ও বলা যায় না।

চিত্রমোদী মহলে তাঁর সমাদরের অভাব দুটি কারণে। প্রথম কারণ তাঁর ছবি সাধারণ দর্শকদের খুশি করে না। ছায়াছবি যেখানে প্রমোদমাধ্যম সেখানে সে দর্শকদের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার একটা অলিখিত প্রতিশ্রুতি পালন করে। ঋত্বিকবাবুর ছবিতে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনো আয়োজন তো থাকেই না, উপরন্তু সেখানে একটা নৈরাশ্যের সুর থাকে; প্রায়শ যা সব ছাপিয়ে ওঠে। বর্তমান সমাজজীবনে সেই নৈরাশ্যের অন্ধকার তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অন্ধকারের বার্তা কয়জনের ভালো লাগবে?

দ্বিতীয় কারণ, শ্রীঘটকের ছবি কখনও পুরস্কার পায়নি—না দেশে, না বিদেশে। সাহেবদের কাছ থেকে বড়ো রকমের একটা হাততালি (স্থূল কথায় ফেস্টিভ্যালের প্রাইজ) পেতে পারলে হয়তো এ দেশের দর্শকদের কাছে তাঁর ছবির চাহিদার সৃষ্টি হত। যেসব চিত্র-ব্যাবসায়ী এখন তাঁর নাম শুনলে ভয় পান, তাঁরাই হয়তো তখন টাকা নিয়ে এগিয়ে আসতেন।

বিদেশি গুণীজনের প্রশংসা তিনি যে একেবারে পাননি, তা নয়। পরলোকগত ফরাসি সমালোচক জর্জ সাদুল শ্রীঘটকের 'অযান্ত্রিক'-এর একরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন 'লে মঁদ' পত্রিকায়। অতি সম্প্রতি ফরাসি চিত্রপরিচালক লুই মাল (যিনি কিছুদিন আগে এদেশে এসে এখানকার কিছু ছবি দেখেন) তাঁকে 'মোস্ট ওরিজিন্যাল ডিরেকটর অব ইন্ডিয়া' বলেছেন। প্রশংসা এদেশেও তিনি কিছু পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভার অথবা চলচ্চিত্রকর্মের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। ফিল্ম্ অ্যাপ্রিসিয়েশনের কথা যাঁরা খুব জোরগলায় বলেন, তাঁদের মুখে এক সময়ে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এই তিনটি নাম

খুব শোনা যেত। এখনও শোনা যায় তবে অনুক্রমে তাঁর নামটা এখন সর্বদা দ্বিতীয় স্থান পায় না। যাক সে কথা। আসলে আমার বক্তব্য, ঋত্বিক ঘটকের নাম ওঁদের সঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চার্য নয়। চলচ্চিত্রকার হিসাবে কে বড়ো, কার শিল্প বেশি উন্নত সে প্রশ্ন এখানে আদৌ তুলছি না। শুধু বলতে চাই, ঋত্বিক ঘটক ভিন্ন কোটির চলচ্চিত্রকার—সকলের থেকে আলাদা।

শিল্প সম্পর্কে শ্রীঘটকের একটি স্পষ্ট ধারণা আছে। রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেন, "শিল্পকে সত্য এবং সুন্দর দুই-ই হতে হবে; কিন্তু প্রথমে সে হবে সত্য, পরে সুন্দর।" এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কি ঋত্বিকবাবুর ছবি সর্বাংশে বস্তুনিষ্ঠ? উত্তরে এক কথায় হ্যাঁ বলা কঠিন। কারণ নিরপেক্ষ রিপোরটেজের ভঙ্গিতে তাঁকে ছবি করতে দেখা যায়নি। এখানে সত্যটি হল পরিচালকের নিজস্ব উপলব্ধির। সত্য অথবা প্রত্যয়ের সত্য।

রাজনীতিক বিশ্বাসে তিনি কমিউনিস্ট। সমাজের বর্তমান দুরবস্থার মূলে শ্রেণিবৈষম্য তথা মালিকশ্রেণির শোষণ এই সাধারণ থিয়োরি তিনি মেনে নিয়েছেন, এটুকু ধরে নিতে পারি। সব ভেঙেচুরে আবার এক নতুন সমাজ গড়ে তোলা হোক, যেখানে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, যেখানে শোষণ থাকবে না, থাকবে প্রতি ব্যক্তির মনুষ্যত্ব বিকশিত হবার সুযোগ—এই সম্ভবত তাঁর কাম্য। এমন এক বিপ্লব ঘটাতে গেলে প্রস্তুতি চাই; সমাজের যারা শরিক তাদের সচেতন করে তোলা দরকার। কমিউনিস্ট হিসাবে সিনেমা শিল্পমাধ্যমের ক্ষেত্রে পরিচালকের সেই দায়িত্ব ঋত্বিকবাবু, অনুমান করা যায়, অস্বীকার করেননি। কিন্তু যেহেতু নিজে শিল্পী, তাই নিছক পার্টি-লাইনের প্রচারকেই তিনি তাঁর মূল মন্ত্র করে নিতে পারেননি। এইখানে এসেছে তাঁর নিজস্ব বোধ আর বিচারের কথা। তা ছাড়া দেশের ঐতিহ্যের প্রতি রয়েছে তাঁর শ্রদ্ধা। সে যাই হোক, ভাবের ঘরে চুরি তাঁর কাজের ক্ষেত্রে প্রশ্রয় পায়নি।

তাঁর বিভিন্ন চিত্র বিচার করলে দেখা যায়, সমাজের অবক্ষয়ের চিত্রকে ফুটিয়ে তোলাকে তিনি তাঁর প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আজকের সমাজের স্তরে স্তরে পাপ আর গ্লানি কীভাবে স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে, ব্যক্তিমানুষের জীবনে তা কী সর্বনাশ ডেকে আনছে বিভিন্ন চিত্রে তারই বিশ্লেষণ। অহরহ প্রেম-ভালোবাসা, মূল্যবোধ আর আদর্শের অপমৃত্যু কীভাবে ঘটছে তা-ও তাঁর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় ('মেঘে ঢাকা তারা'-র প্রণয়ী যুবকটির বিশ্বাসভঙ্গ 'সুবর্ণরেখা'-য় ঈশ্বরের আত্মবঞ্চনা আর ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত স্মরণীয়)। যারা মনুষ্যত্বের শর্ত পালন করতে পারল না, ক্ষুদ্রতার কারাগারে বন্দি থেকে গেল, কিংবা ক্রমশ ধাপে ধাপে নীচে নেমে এল, তাদের প্রতি পরিচালকের অভিশাপ বর্ষিত হয় না। তিনি মহতী বিনষ্টির জন্য দোষী করেন সমাজব্যবস্থাকে। তার ওপর যেন তর্জনি তুলে জানিয়ে দেন : "এ তোমার পাপ, যারা অন্যায় করছে আর যারা অশেষ ক্লেশ ভোগ করছে দুই দলই তোমার শিকার।"

এই মনের কথা প্রকাশ করবার জন্য পরিচালক উপযোগী গল্প বেছে নেন অথবা তৈরি করে নেন। এখানেও তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যয় আর বেদনার ব্যাপার আছে। বর্তমান বাংলা

দেশের দুরবস্থার মধ্যে তাঁর কাছে সবচেয়ে পীড়াদায়ক বস্তু হল উদ্‌বাস্তু সমস্যা। ছিন্নমূল মানুষদের পুনর্বাসনের রীতি-নীতি তাঁর চিন্তার বিষয় নয়; ওদের আর্থিক সংকটও তত না, যত ওদের এবং সেই সঙ্গে গোটা বাংলা দেশের মানুষের আত্মিক সংকট। তিনি দেশ বিভাগকে কোনোমতেই মেনে নিতে পারেননি। সম্ভবত তাঁর ধারণা, বর্তমানে মূল্যবোধের যে-ক্ষয় সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করে চলেছে তার মূলে দেশবিভাগ। তাঁর পাঁচখানি ছবির চারখানিতেই (অর্থাৎ 'অযান্ত্রিক' ছাড়া সব কয়টিতে) উদ্‌বাস্তু চরিত্রের আনাগোনা। দুঃখ-যন্ত্রণার চেয়েও বেদনাদায়ক, নৈরাশ্যের কাছে ওদের আত্মসমর্পণ। যে ক্ষেত্রে মানুষ মৃত্যুর পথে যায়। সে মৃত্যু দৈহিক কিংবা আত্মিক। দ্বিতীয়টি বেশি মর্মান্তিক। এই ট্র্যাজেডি ঋত্বিকবাবুর একাধিক ছবিতে ঘটেছে—বিশেষ করে 'সুবর্ণরেখা'-য় (১৯৬৫)।

সাহিত্য আর চলচ্চিত্রের সম্পর্কের বিষয়ে শ্রীঘটকের ধারণা স্বচ্ছ। সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে ঋণগ্রহণে তিনি দ্বিধা করেননি।

'অযান্ত্রিক', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' এবং 'মেঘে ঢাকা তারা' প্রকাশিত কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত। তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি অদলবদল করেছেন। ঘটনার পরিবর্তন অথবা সংযোজনের চেয়েও দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যটাই এক্ষেত্রে লক্ষ করবার বস্তু। 'অযান্ত্রিক'-এ শ্রীসুবোধ ঘোষের গল্পের মূল সুর ও মেজাজ অবশ্য অনেকখানি বজায় আছে। পরিণতির অংশে পরিচালক তাঁর বক্তব্য (যা জীর্ণ, যা পুরাতন তার প্রতি আসক্তি পরিত্যাজ্য) প্রকাশ করেছেন। এই বক্তব্যের প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমান্তরাল চরিত্র এবং তার উপ-কাহিনি সংযোজিত। দ্বিতীয় চিত্রটি আদৌ মূলানুগ নয়। না মেজাজে, না গল্পবস্তুর দিক দিয়ে। 'মেঘে ঢাকা তারা'তেও পরিচালক নিজের বিচারবোধ অনুযায়ী স্বাধীনতা নিয়েছেন। 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১) ছবির কাহিনি-রচয়িতা তিনি নিজে। 'সুবর্ণরেখা'-র গল্পকার হিসাবে যদিও অন্য একটি নাম আছে, তবু বস্তুত এ কাহিনি তাঁর নিজেরই বলা চলে। মোট কথা, তাঁর ছবির গল্প সবসময় বক্তব্যপ্রধান। বক্তব্যের দিকে লক্ষ রেখেই তিনি চিত্রনাট্য রচনা করেন।

নাটকের প্রতি তাঁর অনুরাগ সন্দেহাতীত। শ্রীঘটক নিজে বহু নাটক লিখেছেন, একদা নাট্যদলের সঙ্গে তাঁর যোগও ছিল। অভিনয়ের ব্যাপারকেও তিনি মূল্য দিয়ে থাকেন। বিদেশের কোনো কোনো চলচ্চিত্রধারায় নাটক উপেক্ষিত, নাট্যরস বর্জন করবার দিকেই সেখানে লক্ষ থাকে। আধুনিক বিদেশি চলচ্চিত্রের পরীক্ষানিরীক্ষাকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, কিন্তু অন্য কোনো দেশের কোনো ধারার অনুসরণে অথবা অনুকরণে তাঁর প্রবৃত্তি নেই। ফর্ম ভাঙাগড়ার পরীক্ষা তিনি নিজেও করেছেন, ('অযান্ত্রিক', 'কোমল গান্ধার') কিন্তু নাটককে বাদ দিয়ে না। ছবির ধর্ম বজায় রেখেও তিনি নাটক গড়ে তোলেন। এ ব্যাপারে মনে হয়, তাঁর আনুগত্য দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি। তাঁর চিত্রনাটকের সুর প্রায়শ দেখি চড়া পর্দায় বাঁধা। সম্ভবত এ ক্ষেত্রে অনুরেপ্রণার উৎস বাংলাদেশের যাত্রা-নাটক। একাধিক ছবিতে যাত্রার বিবেক সদৃশ চরিত্র দেখেছি। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবির চানাচুরওয়ালা এবং 'সুবর্ণরেখা'র হরবিলাস (দুজনেরই মুখে তাত্ত্বিক সংলাপ) যাত্রা-নাটকের বিবেক চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়।

দেশজ শিল্প-ঐতিহ্যের প্রতি ঋত্বিকবাবুর আনুগত্যের আর একটি প্রমাণ সংগীতের প্রয়োগে। তাঁর ছবিতে গানের প্রাধান্য লক্ষণীয়। যারা অবশ্য তাঁর ছবির পাত্র-পাত্রী, সংগীত তাদের জীবনের একটি অঙ্গ। উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত এবং লোকসংগীত তাঁর ছবির সাউন্ডট্র্যাকের বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে থাকে। গানের অংশ কমিয়ে ছবিকে আরও গতিশীল করবার পথ তিনি গ্রহণ করেননি। তার চেয়ে গানকে চিত্রনাট্যের উপকরণ করে তোলাতেই তাঁর আগ্রহ বেশি। যথাযথ পরিমণ্ডল রচনার জন্য, কখনও বা ভাবাবেগের বিশেষ একটি মাত্রা সৃষ্টির জন্যও তিনি সংগীতের আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হন না। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ভারতীয় মার্গ সংগীত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান প্রত্যক্ষ। লোকসংগীত সম্পর্কেও।

শিল্পগতভাবে ঋত্বিকবাবুর ছবির প্রধান ত্রুটি আতিশয্য। বক্তব্যকে সোচ্চার না-করে তিনি শান্তি পান না। অতিনাটকীয়তার আশ্রয় যখন নেন, চূড়ান্তভাবেই নেন। চিত্রনাট্যে যেমন, তেমনই তাঁর প্রকাশভঙ্গিতেও এই আতিশয্যের লক্ষণ প্রায়শ দেখি। দ্বিতীয় ত্রুটি হল শৃঙ্খলার অভাব। প্রত্যেক প্রকৃত শিল্পীকে অবশ্যই অংশত বেপরোয়া হতে হয়। সাধারণ রীতিনীতির বন্ধন তাঁর জন্য নয়—এ কথা মেনে নিয়েও বলব, শিল্পীও কিন্তু যথেচ্ছাচার করতে পারেন না; সংযম ছাড়া সৃষ্টি সার্থক রূপলাভ করতে অক্ষম। শ্রীঘটকের বেপরোয়া ভাব আবার অসতর্কতারই নামান্তর। 'সুবর্ণরেখা'য় তিনি স্বচ্ছন্দে ২৬ জানুয়ারি জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস পালন করিয়ে দিলেন (আসলে ওই তারিখ হওয়া উচিত ১৩ এপ্রিল); গান্ধিজির মৃত্যু ঘটালেন ৩০ জানুয়ারি সকালে (যা সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় ঘটে)। সংবাদপত্র দফতরে টেলিপ্রিন্টারে ওই খবর এসেছে দেখানো হল, অথচ ওইরকম দেশকাঁপানো সংবাদে কাগজের কর্মীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়েছে বলে বুঝতে দেওয়া হল না। প্রথম দুটি ভুলের কারণ অসতর্কতা; তৃতীয় ক্ষেত্রে বাস্তবের বিকৃতি সম্ভবত ইচ্ছাকৃত। ইচ্ছাকৃত হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কি? কিন্তু তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। ওই ধরনের বেশ-করেছি-ভাব চিত্রটির নাট্যাংশের পর্যায়ে পর্যায়ে। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' চিত্রে বেলেঘাটা কিংবা ওইরকম কোনো জায়গার চানাচুরওয়ালাকে ডালহৌসি স্কোয়ার এবং হাওড়া পুল অঞ্চলে ভোরবেলা (যখন স্থানটি জনবিরল) চানাচুর বিক্রির জন্য গান গেয়ে সফর করতে দেখা যায়। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় নায়িকার দাদা কিছুদিন উচ্চাঙ্গ সংগীতের রেওয়াজ করে হঠাৎ বোমবাই পৌঁছে রাতারাতি জনপ্রিয় গায়কে পরিণত হয়ে গেল। এই রকম সরলীকরণের ব্যাপার খুঁজলে যথেষ্ট পাওয়া যাবে; কিন্তু তালিকা দীর্ঘ করে লাভ কী?

শ্রীঘটক বেপরোয়া হবার শক্তি পান কোথা থেকে? সেই উৎস কি মূল বক্তব্যের প্রতি তাঁর প্রত্যয়? এক হিসাবে তা-ই। কিন্তু যুক্তিবাদী, শিল্পরসিক দর্শকদের যে-অংশ ওই প্রত্যয়ের শরিক নন, তাঁরা শ্রীঘটকের 'অযান্ত্রিক' কিংবা 'সুবর্ণরেখা' দেখতে দেখতে আচ্ছন্নবোধ করেন কেন? সমগ্রভাবে পরিচালকের প্রকাশভঙ্গির গুণ অথবা শক্তি এই মোহ সঞ্চারের মূলে। ভাষা যে-লেখকের দখলে, তিনি অনায়াসে যে-কোনো রচনায় একটা অতিরিক্ত ডাইমেনশন বা মাত্রা এনে দিতে পারেন। কনটেনট যা-ই হোক, স্টাইলের

গুণেই সেই রচনা, রসিক পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। শ্রীঘটকের চলচ্চিত্রেও সেই ব্যাপার। রং আর তুলি নিয়ে যেমন নিপুণ চিত্রকর, চলচ্চিত্রের বিবিধ উপকরণ নিয়েও তেমনই শ্রীঘটক আশ্চর্য কাণ্ড করেন। ফিল্‌ম ল্যাংগোয়েজ অথবা চিত্রভাষা সম্পূর্ণত তাঁর আয়ত্তে। তাঁর চিত্রভাষা কিন্তু সহজ, সরল নয়—রীতিমতো জটিল। ফ্রেমিঙের বৈশিষ্ট্য, ক্ষণে ক্ষণে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন, গতিছন্দের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, আনুষঙ্গিক, কখনও বা প্রতীকী শব্দের প্রয়োগ, সংগীত—সব মিলে এক-একটি দৃশ্যপর্যায় এত কথা বলে যে, প্রায়শ মনে হয় ছবিতে সংলাপটাই যেন অতিরিক্ত বস্তু। ক্যামেরার কাজের তো কোনো তুলনাই হয় না ('সুবর্ণরেখা' দেখবার সময় মনে হয়েছিল প্রেক্ষাগৃহে মাটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে); সম্পাদনা তেমনই জোরালো। তাঁর মতে এবং বলা যায় যে-কোনো চলচ্চিত্রবিদের মতে 'সম্পাদনা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী খুঁটি।' একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "একটা ছবির রূপ কল্পনা করতে গেলে প্রথমেই মাথায় আসে তার সম্পাদনার রূপ। সেইটাই ছবিটির রস, গন্ধ এবং আকার নির্বাচন করে দেয়।" দ্রুত দৃশ্য কেটে দৃশ্যান্তরে নিয়ে যাওয়ার কৌশল তো আছেই তারই সঙ্গে গতিছন্দের মাত্রাবদল, কখনও বা হঠাৎ যতি এনে দেওয়া—এই সবের মধ্য দিয়ে সুনিপুণ সম্পাদনায় তিনি যে-এফেক্ট তৈরি করেন, এক কথায় তা বিস্ময়কর। চিত্রভাষাকে যে-জোরের সঙ্গে তিনি ব্যবহার করেন, অনুরূপ শক্তি খুব কম পরিচালকের চিত্রকর্মে প্রত্যক্ষ করেছি। শ্রীঘটকের চিত্রকর্মে আখ্যানভাগের দুর্বলতা অথবা বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব, সংলাপের কৃত্রিমতা ইত্যাদি ত্রুটিকে প্রয়োগসৌকর্য প্রায়শ অনায়াসে অতিক্রম করে যায়।

কয়েকটি দৃশ্যপর্যায়ের উল্লেখ করা যাক। 'অযান্ত্রিক' ছবিতে প্রণয়ী-পরিত্যক্ত যুবতিকে ড্রাইভার বিমলের ট্রেনে চড়িয়ে দেবার দৃশ্যের কথাই ধরুন। পথের মাঝে একটি টিলায় বিষণ্ণ মেয়েটি একলা বসে আছে; বিমল ওকে জগদ্দল গাড়িতে করে নিয়ে এসেছে স্টেশনে: ট্রেন এল, মেয়েটি উঠল; সবশেষে ট্রেন ছাড়বার মুহূর্তে বিমল ওকে কী-যেন বলতে গেল, বলা হল না, শোনা গেল নির্বিকার ট্রেনের ধস ধস শব্দ। সে শব্দ আজও যেন শুনতে পাই। 'মেঘে ঢাকা তারা'-র কথা ভাবলে মনে পড়ে নায়িকার সেই আর্ত স্বর—"আমি বাঁচতে চাই", তখন ক্যামেরা ধীরে ধীরে প্যান করেছে, ওই ধ্বনি কয়েকটি প্রতিধ্বনির আকুতি সৃষ্টি করে ক্ষণকালের জন্য বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে পড়েছে। 'কোমল গান্ধার'-এ পশ্চিমবাংলার সীমান্তে রেলের শানটিঙের দৃশ্যটিও কি ভোলা যায়? রাজ্যের লাইনের শেষ সীমা নির্দেশক বাফারটি দেখানো হয়েছে, সেইসঙ্গে চলন্ত মালগাড়ি; তারপরেই একটি প্রতীকী ধ্বনির প্রয়োগ। সেই শব্দ যেন মর্মভেদী।

'সুবর্ণরেখা' প্রায় আগাগোড়াই অসাধারণ দৃশ্যপর্যায় আর খণ্ডদৃশ্য দিয়ে তৈরি। অভিরামের মায়ের মৃত্যুর ঘটনাটি মনে করুন। মুমূর্ষু মাকে অভিরাম চিনেছে। ওর এতদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা সোচ্চার হয়ে উঠতে চাইল। ঠিক তখনই ক্যামেরার চোখ ওদের মুখ থেকে সরে গিয়ে রেল লাইনের দিকে ফেরানো হয়েছে। প্ল্যাটফরম কাঁপিয়ে ট্রেন এল। ইঞ্জিনের আওয়াজ, যাত্রীর ব্যস্ততা। ওদিকে সামনে একটি বট গাছের ঝুরি ধরে একটি ছোটো ছেলে দুলছে তো দুলছেই (সে কি এখনকার নিরালম্ব মানুষের প্রতীক?)।

সব মিলিয়ে বাইরের পৃথিবীর উদাসীনতা একটি আকাশফাটা বেদনাকে যেন ছাপিয়ে যায়। নির্জন সন্ধ্যায় পরিত্যক্ত বিমানবন্দরে কিশোর-কিশোরী অভিরাম আর সীতার ছুটোছুটির দৃশ্যটিও মন থেকে মুছে যাবার নয়। সন্ধ্যার সেই আবছা অন্ধকারে হঠাৎ ওরা মুখোমুখি হয়েছে কালীবেশী এক বহুরূপীর। সুন্দর পরিবেশে কিশোরীর ভয় আর বিস্ময় তখন মূর্ত। বাস্তব আর বিভ্রমের সীমান্তও সেই ক্ষণে লুপ্ত। এইবার সীতার মৃত্যুদৃশ্যটির কথা ভাবুন। সেখানে ভয়ংকরের রূপ যেন লাবণ্যময়। রক্তাক্ত সীতার দেহ দুই খণ্ডে বিভক্ত, প্রায়-অন্ধ ঈশ্বরের জামায় সেই রক্ত ছিটিয়ে পড়েছে, তখনও কিন্তু সীতার মুখখানিতে এতটুকু বীভৎসতার ছায়া পড়েনি। ভীষণ মৃত্যুর মূর্তি এখানে শান্ত, সুন্দর। বড়ো ক্লোজ-আপে প্রায় এক মিনিট ধরে ওই মুখ দেখানো হয়েছে। ভোলা যায়?

শুভ আর অশুভের লীলা সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা হয়ে যেতে আর একবার দেখেছি। যে-ছবিতে সেটি পুণা ইনস্টিটিউটের জন্য তোলা—নাম 'ফিয়ার'। অল্পদৈর্ঘ্যের এই চিত্রে আপন আপন স্বার্থচিন্তায় মগ্ন, ভালো, মন্দ, কেউ বা প্রবৃত্তির বশীভূত এমন নানা স্ত্রী-পুরুষকে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে একটি আদিম অনুভূতির শরিক করে দেবার দৃশ্যপর্যায়টি অসাধারণ। সেই অনুভূতির নাম ভয়। শ্বাসরোধকারী কয়েকটি মুহূর্তে অনবরত দৃশ্য কাটা হয়েছে; এক-একটি দৃশ্যে ফুটেছে এক-একটি ভয়ার্ত চাহনি। নেপথ্যে হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ওঠানামার মতো আবহ সুরের ব্যঞ্জনা। শঙ্কার পরে স্বস্তি এসেছে সাদা পাখির ঝাঁকের যে-দৃশ্যে সেটি আকাশের গায়ে যেন চিরকালের একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্নও এঁকে দিয়ে গিয়েছে।

সাড়ে পাঁচখানি ছবির মধ্যে কোনটি রস এবং গুণ বিচারে শ্রেষ্ঠ? চট করে উত্তর দেওয়া হয়তো কঠিন। সে যাই হোক, আমাকে যদি একটিকে বেছে নিতে বলা হয়, তবে আমি ভোট দেব 'সুবর্ণরেখা'কে। এ ক্ষেত্রে গল্পের সংখ্যাতীত ত্রুটির কথা আমি মানি। কিন্তু এর তুল্য সর্বাংশে চলচ্চিত্র আমরা কয়টি দেখেছি? বস্তুত, 'সুবর্ণরেখা' দেখে জানা যায়, আমাদের দেশের এক পরিচালক সামান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে কী কাণ্ড করতে সক্ষম। সেই কাণ্ডের স্বরূপ আজও যে-চিত্ররসিকের কাছে অনুদ্‌ঘাটিত তাঁর জন্য আমি সমবেদনা অনুভব করি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জীবন্ত ঋত্বিক

রামপুরহাট থেকে সাত-আট মাইল দূরে তুম্বুনি নামে একটি গ্রামে গিয়েছিলাম ক-দিন। একদিন রাত বারোটার পর শখ চাপল বেড়াতে বেরুবার। যদিও শীতকাল, তবু মস্ত বড়ো একটা চাঁদের অনেকখানি জ্যোৎস্নায় পথঘাট ঝকঝক তকতক করছে। লাল রঙের রাস্তা, ঈষৎ ঢেউখেলানো, দূরে পেনসিল স্কেচের মতন টিলা ও শালের জঙ্গল। খুব ভালোভাবে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা দলে চার-পাঁচজন। অনেকটা রাস্তা হেঁটে, গান গেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম আমরা। মনে হল সারা রাতই বেড়ানো যায়। আমরা প্রায় অন্য একটি গ্রামের কাছে পৌঁছে গেছি, এমন সময় দেখলাম উলটো দিক থেকে পরপর তিন-চারটে গাড়ি আসছে হেডলাইট জ্বেলে। বেশ অবাক হলাম। এত রাত্রে গ্রামের রাস্তায় তিন-চারটে গাড়ি? তাও তো ট্রাক নয়!

আমাদের সঙ্গে একজন স্থানীয় লোক ছিল, সে বলল, "আজই এখানে একটা ফিল্‌মের দল এসেছে, বোধহয় তারাই শুটিং-এ-বেরিয়েছে!"

প্রথম জিপগাড়িটা আমাদের কাছাকাছি আসতেই দেখলাম, বাইরের দিকে অনেকখানি শরীর ঝুঁকিয়ে বসে আছেন একজন অত্যন্ত দীর্ঘকায় মানুষ, মাথাভরতি এলোমেলো ঝাঁকড়া চুল, হাতে একটা বোতল।

চিনতে আমাদের এক মুহূর্তও দেরি হল না। ঋত্বিককুমার ঘটক।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা রাস্তার ধারে ডাইভ মারলাম। খানাখন্দে গড়িয়ে পড়ে সেখানেই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইলাম। দেখতে পেলেই হয়েছিল আর কী! ঋত্বিক ঘটককে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু একবার উনি দেখতে পেলে আমাদের বেড়াবার দফারফা।

গাড়িগুলো চলে যাবার পর আমরা ধুলোটুলো ঝেড়ে আবার রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ালাম। এবার বোধহয় আমাদের উলটো দিকে হাঁটা উচিত। কিন্তু চাঁদের আলোয় আমাদের নেশা লেগে গেছে, তক্ষুনি ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই কারুর। গাড়িগুলো নিশ্চয়ই অনেক দূরে যাবে, সুতরাং আমাদের ভয়ের কিছু নেই।

আরও খানিকটা পথ হেঁটে এসে, একটা বাঁক ঘুরতেই দেখলাম গাড়িগুলো থেমে পড়েছে, শুটিং-এর উদ্যোগ চলেছে। শোনা গেল সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের জোরালো এবং জড়ানো কণ্ঠ।

অত রাত্রেও কিছু গাঁয়ের লোক এসে ভিড় করছে আস্তে আস্তে। আমাদের মধ্যে একটা মতবিভেদ দেখা গেল। এত কাছে এসেও আমরা ঋত্বিক ঘটকের শুটিং দেখার সুযোগ ছাড়ব কি না! আমাদের মধ্যে যে দু-একজনকে ঋত্বিক ঘটক খুব ভালোরকম চেনেন, তাদের একটুও ইচ্ছে নেই ওখানে দাঁড়াবার। কারণ উনি একবার চিনতে পারলেই আগামী দু-তিনদিন ওঁর সঙ্গেই থাকতে হবে, মানতে হবে ওঁর হুকুম। ঋত্বিক ঘটকের চোখে চুম্বক আছে। তা এড়িয়ে যাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। শেষ পর্যন্ত আমরা মাথায় খুব করে চাদর মুড়ি দিয়ে প্রায় মুখ ঢেকে গ্রামের লোকদের ভিড়ের মধ্যে মিশে রইলাম। এবং খানিকক্ষণ বাদে একবার উনি খুব কাছাকাছি আসতেই আমরা পিছু হটে হটে একেবারে কেটেই পড়লাম।

পরদিন দুপুরবেলা আমরা রামপুরহাটে একটা হোটেলে খেতে গেছি। দারুণ খিদে পেয়েছে। সবেমাত্র কলাপাতা, নুন আর কাঁচালংকা দিয়েছে, রান্নাঘরে ভাতের ফ্যান গালার গন্ধ পাচ্ছি, খিদের চোটে দু-এক কণা নুনই ঠেকাচ্ছি জিবে, এমন সময় দরজা ঠেলে সদলবলে ঋত্বিককুমারের প্রবেশ। দিনেরবেলাতেও সেই উশকোখুশকো চুল, টকটকে চোখ, পাঞ্জাবির পকেট ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন একটা শিশি। রাজা-বাদশার মতন তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, কই, খাবার কোথায়?

আমাদের খাওয়া মাথায় উঠল। ওর চোখ এদিকে পড়ার আগেই আমরা কলেজের ছাত্রদের মতন পেছনের দরজা দিয়ে কেটে পড়লাম।

উনি আমাদের কাছে টাকা পেতেন না, কোনোদিন ঝগড়াও হয়নি, বরং ওঁর সঙ্গে একটা স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্কই ছিল, তবু ওঁকে দেখেই কেন আমরা পালাচ্ছিলাম, তা হয়তো ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না। ওঁর মধ্যে একটা দারুণ ছটফটানি ছিল। অনেকের প্রতিভা পুরোপুরি সৃষ্টির দিকে না-গিয়ে অনেকটা আত্মক্ষয়ের দিকে যায়। সেইজন্য তিনি বহু কাজই সম্পূর্ণ করতে পারেননি। এবং আত্মক্ষয়ের নেশায় যাঁদের পায়, তাঁরা কাছাকাছি অন্য কারুর ব্যক্তিত্বের কোনো তোয়াক্কা করেন না। এইসব মানুষকে দূর থেকেই বেশি শ্রদ্ধা করা যায়। পৃথিবীতে এরকম অনেক দেখা গেছে।

কিন্তু আর একটি দিন যা দেখেছি, পৃথিবীতে, চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সেরকম দৃশ্য আর কখনও কেউ দেখেছে কি না জানি না। তাই সেটা এখানে লিখে রেখে যেতে চাই।

রামপুরহাটে যে ফিল্মের শুটিং চলছিল, কয়েকমাস বাদে জানতে পারলাম, অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সেটা কোনোক্রমে শেষ হয়েছে। ছবির নাম 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'। খবর পেলাম এক সন্ধেবেলা টালিগঞ্জের এক স্টুডিয়োর প্রোজেকশান হলে সেটা দেখানো হবে। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আমরা দলবেঁধে সেটা দেখার জন্য ছুটলাম।

পৌঁছে দেখি, ততক্ষণে ছবি শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকার হলঘরে পঁচিশ-তিরিশজন লোক, আমরা পা টিপে টিপে পেছন দিকে গিয়ে বসলাম। পর্দায় দেখি ঋত্বিক ঘটকের নিজের চেহারা। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, দাড়ি না-কামানো মুখ, উশকোখুশকো চুল, হাতে

মদের বোতল। প্রথম থেকেই চমক খেলাম! কোনো ছবিতে পরিচালকের নিজের এরকম ছবি কে প্রত্যাশা করে?

আরও কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বুঝলাম, এ ছবিতে ঋত্বিক ঘটক আগাগোড়াই অভিনয় করেছেন, অর্থাৎ তিনিই নায়ক। তিনিই গল্প লিখেছেন—না, গল্প লেখেননি, নিজের জীবনটা ফোটাচ্ছেন। যাঁর জীবনকাহিনি, তিনিই নিজে অভিনয় করেছেন এবং তিনিই পরিচালক—একসঙ্গে এই তিনটি জিনিস আর কোনো ফিল্‌মে দেখা গেছে? এহ বাহ্য! এখানেই শেষ নয়।

ছবি চলছে এমন সময় একজন লোক চেঁচিয়ে উঠল, লাইট! এখানে লাইট কম! শুয়ারের বাচ্চা!

আমরা অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকালাম। কে কথাটা বলল, বুঝতে পারলাম না।

খানিকটা বাদে আবার চিৎকার, এ জায়গাটা আবার হোক! ঠিক হয়নি! একদম ঠিক হয়নি!

একজন কেউ বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ কী হচ্ছে? ডিসটার্ব করছেন কেন?

—চোপ! কোন্ শুয়োরের বাচ্চা! আমি বলছি ঠিক হয়নি, আবার হোক!

আমরা অবাক। এ কি থিয়েটার নাকি যে আবার হবে, ঠিক করে নেবে?

খানিকক্ষণ চুপচাপ চলবার পর আবার হুংকার, কী হচ্ছে, অ্যাঁ? এটা কি ছবি? কিস্যু হচ্ছে না!

কথা বলতে বলতে লম্বা মতন লোকটি উঠে দাঁড়াল। সেই চেহারা, সেই চুল এবং হাতে বোতল—চিনতে ভুল হবার কোনো উপায় নেই! পর্দাতে তো ঠিক ওই চেহারাতেই নায়ককে দেখা যাচ্ছে!

টলতে টলতে উঠে উনি এগিয়ে গেলেন, মনে হল যেন স্ক্রিনটাই ছিঁড়ে ফেলবেন। দু-তিনজন শুভার্থী দৌড়ে গিয়ে ওঁকে জাপটে ধরে বলল, ঋত্বিকদা, কী করছেন কী! বসুন!

কিন্তু অত বড়ো শক্তিমান মানুষটিকে ধরে রাখে কার সাধ্য! এক-একবার এসে বসছেন, আবার উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছেন, কিস্যু হয়নি, কোন্ শালা কী বোঝে, অ্যাঁ? এসব কী হচ্ছে কী এখানে?

ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে ঋত্বিককুমারের ছবিটা চলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগলেন তিনি নিজে। উঠে দাঁড়িয়ে বোতলে এক-একটা চুমুক দিয়ে তিনি কখনও বলতে লাগলেন, লাইট কোথায়, অ্যাঁ? লাইটের সেন্স নেই? এই ফ্রেমটা ভাঙো না শালা? এক ফ্রেম কতক্ষণ চালাবে?

কেউ ওকে সামলাতে পারছে না। উনি বারবার ছুটে যাবার চেষ্টা করছেন স্ক্রিনের কাছে, একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। মনে হল অজ্ঞান হয়ে গেছেন?

অনেকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, থাক, থাক! ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত ওইখানেই থাক!

আমরা যেন থ্রি-ডাইমেনশনাল ছবি দেখছি! পর্দায় যে-ঋত্বিক ঘটককে দেখছি, তিনিই জ্যান্ত হয়ে শুয়ে আছেন পর্দার নীচে।

কিন্তু চুপচাপ থাকার পাত্র তো উনি নন। শুয়ে শুয়েই একটু বাদে উনি দারুণ জোরে নাক ডাকাতে লাগলেন। এদিকে ছবি তখন দারুণ সিরিয়াস জায়গায়—জঙ্গলের মধ্যে নকশালদের ঘিরে ফেলেছে পুলিশ, তাদের মাঝখানে পথ-হারানো নায়ক ঋত্বিক—এই সময় আসল ঋত্বিকের নাসিকাধ্বনিকে কিছুতেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে নেওয়া যায় না, হাসি পেয়ে যায়। দর্শকদের মধ্য থেকে জনাচারেক উঠে গিয়ে ওকে চ্যাংদোলা করে বাইরে দিয়ে এল।

বাকি সময়টা আমরা নির্বিঘ্নে ছবিটা উপভোগ করলাম।

শেষ হবার পর বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, বাইরের মাঠে ঘাসের ওপর শুয়ে আছেন তিনি। এখন অনেকটা জ্ঞান ফিরেছে। দু-চোখে শুকনো জলের রেখা। মাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছেন। আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু হল কি! এই যে হাবিজাবি মাথামুণ্ডু এতসব করলাম এতদিন, এতে কিছু হল?

এটা একটা বিরাট প্রশ্ন, যার উত্তর দেবার সাধ্য আমার নেই। তবে সেইদিনই একটা কথা মনে হয়েছিল, ছায়াছবির চেয়েও জীবন্ত ঋত্বিককে অনেক বেশিদিন মনে থাকবে।

শৈলেশ্বর ঘোষ

নিজের আবিষ্কৃত সত্য

বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির নরককুণ্ডের মধ্যে যে-কোনো সৃষ্টিশীল আত্মারই শ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকা দুরূহ ব্যাপার। এই সংস্কৃতিকে দখল করে আছে মাঝারি মাপের দুনম্বরি লোকজন। ধান্দাবাজরাই এই সংস্কৃতির ধারক আর বাহক। এই পরিমণ্ডলের মধ্যে হঠাৎ যদি কোনো একরোখা বেয়াড়া এবং মাথায়-উঁচু কেউ এসে পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ফেলা হয় ও তার মর্মান্তিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাকে ধর্ষণ করা চলতে থাকে। যদি সে অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করে তো ভালো কথা, আর যদি না করে তবে অত্যাচারের মাত্রা বাড়ে—দাবি একটাই : আত্মসমর্পণ করো, একজন কবিই হোক বা একজন গদ্যলেখক হোক বা একজন চলচ্চিত্রকার হোক—যদি সে দুনম্বরি হতে রাজি না হয়—তবে তাকে এগোতে হয় নিজের স্বাধীনতার খোঁজে, সত্যের দিকে। বুর্জোয়া ইতিহাসের সোনার শেকলটি গলা থেকে খুলে ফেলামাত্রই সবগুলি আঙুল উঠে যায় তারই দিকে। দু-ধরনের লড়াই তাকে শুরু করতে হয়, প্রথম লড়াই নিজের বিরুদ্ধে নিজের—নিজের যে-অংশটা মিথ্যা তার বিরুদ্ধে—যেটা সবচেয়ে কঠিন লড়াই, অন্যটা বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। যে-মুহূর্তে সে চিহ্নিত সেই মুহূর্ত থেকেই বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান তাকে ধ্বংস করতে এগিয়ে আসে। ভিতরে এবং বাইরে লড়াই করতে করতে সে ক্রমেই এগিয়ে আসে নিজস্ব সত্যগুলির দিকে—যা সে আবিষ্কার করে নিজেরই জীবনের মূল্যে।

সত্যকে আবিষ্কার করা এক আর সেই সত্যকে অনুসরণ করা আর এক। সৃষ্টিশীল আত্মার পক্ষে তাকে অনুসরণ না-করে উপায় নেই। যে-মুহূর্তে সে এই সত্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে সেই মুহূর্তেই তার মৃত্যু ঘটবে। বিশ্বাসঘাতকদের পার্থিব লাভ অনেক আর বিশ্বাসঘাতকদের দেখা যে প্রায়শই পাওয়া যায়, এ তো আমরা ভালো করেই জানি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজের আবিষ্কৃত সত্যের প্রতি অনুগত থাকা বড়োই কঠিন কাজ।

ঋত্বিক ঘটক সেই বিরল মানুষদের একজন যিনি নিজের আবিষ্কৃত সত্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না-করে শেষদিন পর্যন্ত কাটাতে পেরেছিলেন। ঋত্বিক নামক এক সামান্য মানুষের মৃত্যু হয়েছিল অনেক আগেই, এবং জন্ম হয়েছিল এক সত্যের—অর্থাৎ ওই মানুষটির প্রকৃত সত্তার, আমরা তাকেও ঋত্বিক নামেই জানি।

সত্য যে শিল্পের লোমশ চামড়ায় ঢাকা থাকে না এটা 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' না-দেখলে বাঙালির মগজেই ঢুকত না। ঋত্বিককে যদি আমরা স্বাধীনতা-উত্তর কালের-পটভূমিতে স্থাপন করে দেখি তবেই তার যথার্থ পরিচয় পাব—বাঙালি মধ্যবিত্তের লক্ষ্মীপূজা, উদ্‌বাস্তুদের অপমৃত্যু, অবসাদগ্রস্ত বেকার যুবকদের তামাশা টিটকিরি-ধর্ষণকাতর বুর্জোয়াতন্ত্রের শিৎকার, ১০৮ বাবাদের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিদেশি গুপ্তচর সংস্থার পয়সায় পুষ্ট বাঙালি সাহিত্য ব্যাবসায়ী, মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির মড়ক, নানাধরনের পুরস্কারের জন্য তদ্বির ও প্রভুদের সেবা করার কুকুরবৃত্তি, শিক্ষিত শ্রমিকদের সিকিউরিটির ওপর পা রেখে মেধাহীন উল্লাস, শোষণের উদ্দেশ্যে ৩৩ কোটি কুসংস্কার বাঁচিয়ে রাখা, ফর্দ আর না-বাড়িয়েও বলা যায় এই সামাজিক বেশ্যাবৃত্তি সংস্কৃতি ও সাহিত্যসেবীদের বাঁচিয়ে রেখেছে—আর এই ধর্ষকামী বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানই জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋত্বিক ঘটকের ঘাতক।

শিল্প নয় সত্যের জন্য ঋত্বিকের এই আত্মত্যাগ আমাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যময় ঘটনা—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টিশীল আত্মাদের পক্ষে উদ্দীপনাময়। জীবনবিরোধী বুর্জোয়া শিল্পের ক্রীতদাস হওয়া নয়, সত্যের জন্য যথার্থ বিপ্লবী হওয়া। একজন প্রকৃত বিপ্লবী ছাড়া অপরাধী এই সভ্যতার নরককুণ্ড ভেদ করে কারও পক্ষে জীবনসত্যের কাছে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। এ কথা ভুলে গেলে চলে না যে, গাধা বা খচ্চর কখনও অশ্বের তেজ ও গতি পায় না—কিন্তু পরিহাসের বিষয় হল যে, চূড়ান্তভাবে বিপ্লববিরোধী সে-ই সবচেয়ে বেশি করে বিপ্লবী হবার ভান করে।

ঋত্বিকের মধ্যে আমরা সেই শক্তি দেখেছি, যে-শক্তি একজন প্রকৃত বিপ্লবীর, যে-শক্তির বলে সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য করেও একজন প্রতিবাদ করে—মৃত্যুও যখন একটা অস্ত্যর্থক মূল্যবোধে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বিপ্লব যেমন একটা জাতির কাছে নতুন অভিজ্ঞতা—নতুন অভিজ্ঞতা বলেই বুর্জোয়া বিপ্লবকে ভয় পায়, বুর্জোয়ার সমস্ত ধ্যানধারণা বাসনা প্রবৃত্তিকে তছনছ করে দেয় এই অভিজ্ঞতা—যে-কোনো যথার্থ সৃষ্টিই নতুন অভিজ্ঞতা। সত্যই এই নতুন অভিজ্ঞতা। Surface reality-কে অতিক্রম করলে তবেই এই নতুন অভিজ্ঞতা পাওয়া সম্ভব। চিরাচরিত ফর্মকে ভেঙে দিলেই আসে নতুন অভিজ্ঞতা। 'সুবর্ণরেখা' এবং 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' আমাদের সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা দেয়। চলচ্চিত্র মাধ্যম নিয়ে ঋত্বিক যেভাবে সত্যের কাছে চলে আসেন তা কেবল কবিতাতেই সম্ভব। আজও যে সত্যের চেয়ে শিল্পের ন্যাকামি বেশি দাম পায় মানুষের কাছে, তার কারণ সংস্কৃতির পনেরো আনা ভাগই মিথ্যা—কবিতা—সত্য যখন এই সংস্কৃতিকে চাবকাতে থাকে তখন সংস্কৃতির মুরুব্বিরাই মুখোশ খুলে ফেলে এবং সাপের আকার নেয়—এই সংস্কৃতির বিষেই নীল হয়ে মরতে হয় সৃষ্টিশীল আত্মাকে। সত্তার সক্রিয় এবং গতিশীল রূপটি ধরতে পারাটাই প্রকৃত সৃষ্টি, জীবনানন্দ, ঋত্বিক তাই ধরেছিলেন। 'মিথ্যাই যখন এক জাগতিক নিয়মে' পরিণত হয়েছে তখন সত্যকে নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মহৎ সৃষ্টিমাত্রই নিষ্ঠুর। যে-কোনো প্রকৃত জীবনই দুর্বল ভীরু ও কাপুরুষের কাছে ভয়ংকর। শিল্পের কন্ডোমটা

পরানো না থাকলে মিথ্যাচারী মানুষের দল ভয় পায়, মধ্যবিত্ত ভাঁড়েরা ঘেউঘেউ করে। কিছু কিছু বই যে পৃথিবীতে লেখা হয়, কিছু কিছু ছবি যে তোলা হয় যা এই মানুষের মাথাকেই মাধ্যাকর্ষণের বাইরে লাথি মেরে ফেলতে চায়।

'সাফল্য' মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে অশ্লীল শব্দ। জানোয়ারই কেবল সফল হতে পারে, মানুষ পারে না—পারে না কারণ চেতনাস্রোত কখনও থামে না। চেতনাস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুর প্রাপ্তির আশা করাই হল বুর্জোয়া পদ্ধতি। একটা ক্যানসার কোষ যেমন সুস্থ কোষগুলি আক্রমণ করে নষ্ট করে দেয়, তেমনি বুর্জোয়া জাড্যে ও ধর্ষণচিন্তায় আক্রান্ত মানুষ তার চারপাশের সুস্থ মানুষদের নষ্ট করতে থাকে। অসুস্থ ক্যানসার কোষের যেমন ধ্বংসক্ষমতা বেশি তেমনি চেতনাস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন বুর্জোয়ার ধ্বংসক্ষমতা বেশি। 'সাফল্যের কমার্স'—এই হল আজকের বুর্জোয়া সংস্কৃতির মূলকথা। গোটা পঞ্চাশের দশকের কবি-লেখকদের আমরা এই সাফল্যের কমার্স করতে দেখেছি, ক্ষীণ দু-একটা ব্যতিক্রম ছেড়ে দিলে। বুর্জোয়া চায় কবি-লেখকরা তাদের সংস্কৃতির নাটবলটু হবে, ওদের এক-একটা Spectacle হিসাবে বুর্জোয়া তুলে ধরবে, এবং ওই Spectacle-এর দিকে সবার নজর সব টেনে নেবে।

মানুষের এ পর্যন্ত লিখিত ইতিহাস, পরজীবী বুর্জোয়ার ধর্ষণপ্রবৃত্তি মেটানোর ইতিহাস—মানুষের স্বাধীনতা ও ভালোবাসার কোনো স্থান সে ইতিহাসে নেই। বুর্জোয়ার কাছে ভালোবাসা হল এক মৃতদেহের সঙ্গে আর এক মৃতদেহের ঘর্ষণের শব্দ। আর স্বাধীনতাকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায় বুর্জোয়া। যত দেবতার জন্ম দিয়েছে বুর্জোয়া সবগুলিই হয় যুদ্ধক্ষেত্রে না হয় শোবার ঘরে মরেছে। আর বাইরের দিকে নয়, আমাদের তাকাতে হচ্ছে ভিতরের দিকে—যেখানে তৈরি হয়ে আছে আর এক গোপন ও বুর্জোয়া সংস্কৃতিবানের কাছে 'নিষিদ্ধ' ইতিহাস। বিশ শতকের শেষ সময়ে আমরা ঢুকে পড়ছি সেই নামহীন অন্ধকারের মধ্যে—সংশয়, সন্দেহ, ঈশ্বরহীন অপরিমেয় শূন্য, যৌনতার বিষ ও ক্ষয়, আত্মার আর্তনাদ, বিদ্রোহ ও পরাজয়—আজকের অস্পষ্ট গোধূলিতে এই চূড়ান্ত ও সর্বনাশা ভয়—কিন্তু আত্মসমর্পণ নয়, স্পিরিট আত্মসমর্পণ করতে জানে না, ভয়ের উৎসকে খুঁজে নিয়ে মুক্তি চায় এই ভয় থেকে। ফলে ঋত্বিকের ওই ছবিতে যে-গুলিটি বিদ্ধ হল, তা তো আসলে আমাদের বুকেই—কিন্তু এ কথা ঠিক যে, গুলিবিদ্ধ হওয়া-মাত্রই মৃত্যু হয় না আমাদের, স্বাধীনতাই ছিল আমাদের মূলমন্ত্র, তাই মৃত্যুর আগে 'স্বাধীনতা' শব্দটি উচ্চারণ করার সময় মেলে। স্বাধীনতা! হা! কেউ স্বাধীনতার জন্য না-খেয়ে মরে, কেউ স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে লাখপতি হয়—সাহিত্য-সংস্কৃতির মুরুব্বি হয়!

আমাদের কাছে 'স্বাধীনতা' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ক্রমশই বুঝতে পারছি আমরা কতরকম ভাবে পরাধীন, পরাধীনতা বিষয়ে সচেতন হওয়ামাত্রই চেষ্টা শুরু হয় স্বাধীনতা ফিরে পাবার। সাহিত্যই হোক বা আঁকা ছবিই হোক বা ফিল্মই হোক,—তা খাঁটি কি না সেটা বিচারের মাপকাঠিই হল তাতে মানুষের পরাধীনতা বিষয়ে সচেতনতা কতটা আছে। আর সেই পরাধীনতার পর্বত অতিক্রম করে স্বাধীনতার কাছে কতটা সে পৌঁছোবার চেষ্টা করেছে, এবং তার জন্য কতটা আত্মত্যাগ স্বীকার করেছে।

সচেতন আত্মাগুলি যে আজ সমষ্টিগত অন্ধকারের রক্তপিপাসার বলি—ঋত্বিক এই সত্য ধরতে পেরেছিলেন, যেমন জীবনানন্দ ধরতে পেরেছিলেন—যা কিছু সুন্দর ও ভালোবাসাপূর্ণ তাকে হত্যা করাই আজকের পৃথিবীর সমষ্টিগত আনন্দ, স্বাভাবিক আনন্দ পাবার ক্ষমতা মানুষ হারিয়ে ফেলেছে—হত্যা ও ধর্ষণ ছাড়া মানুষের উল্লাস নেই। 'উল্লাস' আর আনন্দ আজ সমার্থক শব্দ। বুর্জোয়ার কামনার দ্বারা যে আমাদের স্বপ্ন ও কল্পনা বিনষ্ট, ঋত্বিক সেটা স্পষ্টই ধরতে পেরেছিলেন। এইজন্যই ভাগ্য, ভগবান ও সংস্কৃতির কারবারে তিনি সফল ফিরিওয়ালা হতে পারেননি। নিজের আবিষ্কৃত সত্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ঋত্বিকের এই আত্মত্যাগ, যাকে সমাজ প্রতিষ্ঠান ও অপসংস্কৃতির বাহকরা আত্মত্যাগ বলে চালাবার চেষ্টা করেছিল, এর মধ্যে রূপক নেই। খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার এই বিসর্জন পর্ব। আত্মবিসর্জনকারী ছাড়া অন্যেরা এই দৃশ্যে কোনো মজা পায় না বরং ভয় পায়—নিজেদের গা বাঁচিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখে। সমাজ প্রতিষ্ঠানের ডাল ধরে ঝোলে যে-বাঁদরের দল তারা বলে এই আত্মবিসর্জনও অন্যায়—বলার কারণ হল ওদের ইতিহাসে 'লালসা' ছাড়া অন্য কোনো আবেগ নেই। এই আত্মবিসর্জন সম্পূর্ণ হলে বেজে ওঠে ঢাকঢোল, ঋত্বিকের বেলাতেও তাই হয়েছে—তাঁর মৃত্যুর পরই শিল্পসংস্কৃতির ঢাক খুব জোরের সঙ্গেই বেজে উঠেছে।

যে কেউ পরাধীনতার শেকলগুলি খুলে ফেলতে চায়, ইতিহাস তাকে খুন করে!

যে কেউ সত্তার আনন্দময় অবস্থার দিকে যাত্রা শুরু করে, আত্মাহীনরা তার হৃৎপিণ্ড উপড়ে নেয়!

যে কেউ নিজের আবিষ্কৃত সত্যকে শব্দ বা ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে, মধ্যবিত্ত অপরাধীরা তার রক্ত পান করে!

যে কেউ নিজের জীবনকে স্বপ্নে রূপান্তরিত করতে চায়, সমষ্টিচক্র তার স্বপ্নের ওপর পেচ্ছাপ করে!

বিপ্লবী আশ্রয় নেয় জঙ্গলে, কিন্তু সেখানেও তাকে ঘিরে ফেলা হয় ও হত্যা করা হয় অতিনাটকীয় পদ্ধতিতে—যে কেউ আত্মসত্য খুঁজে পাবে এবং বাস্তবের বিকারকে অস্বীকার করবে তার এই পরিণামই হবে?

স্বপ্নহীন কল্পনাহীন ধ্বংস-আতঙ্কে ঠান্ডা বিশ শতকের শেষ অপরাহ্ণ আমাদের চোখের সামনে-পিছনে অপরাধী ইতিহাসের ধূসর পটভূমি—আত্মাহীন শূন্যতা!

মানুষ চায় নতুন জীবন, যা একই সঙ্গে বন্দুকের নল ও প্রভাতসূর্য থেকে জন্ম নেবে!

জ্বালা

সুব্রত রুদ্র

জীবিত মানুষের কাছে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা, পরিচিত হলেও—তা একটা আলাদা স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শ সমেত বেদনার অনুভূতি নিয়ে আসে। কিন্তু আত্মহত্যার ঘটনায়, জীবিত মানুষ দুরূহ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে থাকে—এই প্রশ্ন তার সামনে রহস্যের পটভূমি সৃষ্টি করে। মানুষ কেন আত্মহত্যা করে—এই জিজ্ঞাসা সভ্যতার প্রথম থেকেই সমাজে ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। মানুষ তার কোনো সমাধান খুঁজে পায়নি বলেই, এই ঘটনাকে সে অশুভ, অন্যায়, পাপ বলে চিহ্নিত করেছে। ধর্মের বিচারে, আইনের চোখে, সামাজিক আচরণবিধি হিসেবে,—আত্মহত্যার উৎস যতই দুঃখজনক বা যন্ত্রণাদায়ক হোক—এই জীবনবিরুদ্ধ ঘটনাকে ক্ষমার চোখে দেখা হয়নি।

কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আত্মহত্যা ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। তার সংখ্যা, পরিধি, বৈচিত্র্য কিছুমাত্র কমেনি। এই কারণে মানব আচরণ সম্পর্কে যাঁরা উৎসুক—সেই, মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, নৃ-তাত্ত্বিক, জীববিজ্ঞানী এবং সাহিত্যিকরা এ সম্পর্কে নিজস্ব ধ্যানধারণার কথা আমাদের জানিয়েছেন। তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি জটিল। সেই আলোচনার গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতে, মাত্র দুটি ধারণার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তার প্রথমটির উদ্গাতা হলেন ফ্রয়েড, এবং দ্বিতীয়টির এমিল ডার্কহাইম। ফ্রয়েডের ধারণায় মানুষের কামনা-বাসনা-ইচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হলে তার মনে প্রচণ্ড সংক্ষোভের সৃষ্টি হয়, এবং তা যদি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে (Aggression) আত্মপ্রকাশ করে,—তা চরম অবস্থায় দুটি রূপে ফুটে ওঠে। এই ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ ভঙ্গি যদি বাইরের দিকে প্রযুক্ত হয়, তখন সে পাত্র-পাত্রী অনুযায়ী হত্যা করে, আর যদি নিজের দিকে প্রযুক্ত হয়, তাহলে মানুষ আত্মহত্যা করে। ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত এই যে, হত্যা ও আত্মহত্যা, আসলে একই মুদ্রার দুটি দিক।

ডার্কহাইম আত্মহত্যাকে সামাজিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন. তাঁর কাছে আত্মহত্যা আসলে একটি সামাজিক ঘটনা, তাঁর ধারণায় আত্মহত্যার কারণ, বাইরের পরিবেশে খুঁজে পাওয়া যায়, ব্যক্তি-মানসের অন্তর্জীবনে নয়। সামাজিক পরিবেশে ভাঙনের সৃষ্টি হলে তার গঠন শিথিল হলে, মানুষ সমাজের কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। সমাজের বিধি,

আচরণ, সামাঞ্জস্য বিধান, প্রভৃতি বিষয়ে তার যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে আসে। যে-সমাজে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ, অর্থাৎ পারস্পরিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ এবং নানা সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় যুক্ত, সে সমাজে আত্মহত্যার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে শিথিল করা ভঙ্গুর সমাজের আত্মহত্যার চেয়ে অনেক কম।

আত্মহত্যা সম্পর্কে এই কথাগুলি মনে এল, একটি নাটক পড়ার পর। নাটকটি আজ থেকে ৩৪ বছর আগে, সেই ইংরেজির ১৯৫০ সালে লেখা হয়েছিল,—প্রকাশিত হয়েছে ১৫ বছর আগে। নাটকটির নাম 'জ্বালা'। নাট্যকারের নাম ঋত্বিককুমার ঘটক। 'জ্বালা' নাটকের ছ-টি চরিত্রের পাঁচটি চরিত্র আত্মহত্যা করে। বিদেহী জীবনে পরস্পর মিলিত হয়ে আত্মবীক্ষায় রত। ষষ্ঠ চরিত্রটি উন্মাদ, অর্থাৎ পাঁচটি চরিত্র দেহে মৃত, আর বাকি চরিত্রটির মন বা আত্মা মৃত।

এই নাটক ঋত্বিক ঘটক ঠিক কেন লিখেছিলেন, ভূমিকায় তা স্পষ্টভাবে বলা নেই। তিনি শুধু জানিয়েছেন : "এই নাটকটি ১৯৫০ সালে লেখা হয়েছে। এর একটি অত্যন্ত বিষাদময় পটভূমি আছে। ওরই কিছুদিন আগে কলকাতা শহরে এক মাসের মধ্যে বহু মানুষ আত্মহত্যা করেছিল। তাদেরই কয়েকটি চরিত্র গ্রহণ করে এই নাটকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। একমাত্র উন্মাদের চরিত্র ছাড়া আর সব কটি চরিত্র জীবন থেকে গ্রহণ করা। সেদিক থেকে নাটকটিকে Documentary বলা যেতে পারে।"

'জ্বালা'র বিষয়বস্তু হিসেবে চরিত্রগুলির আত্মহত্যার যে-বিবরণ পাওয়া যায়, তাও এক বিশেষ ছকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পাঁচটি চরিত্রই স্থূল বা শারীরিকভাবে বেঁচে থাকবার কোনো সুযোগ না-পেয়ে আত্মহত্যা করেছে। কালীঘাট স্টেশনের স্টেশনমাস্টারের স্ত্রী শেফালি গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেন—কারণ পাঁচটি ছেলেমেয়ের দিনের পর দিন উপবাস তাঁর সহ্য হয়নি। জিপিও-তে কর্মরত বৃদ্ধ পূর্ণবাবু বিনা কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য দরজায়-দরজায় ঘুরেছেন, কিন্তু পারেননি। ব্যারাকপুরের এক চটকলের মজুর ভোলার টিবি হয়, কাজ করার সময় ফুসফুসে পাটের গুঁড়ো ঢুকে যাওয়ার ফলে, চিকিৎসার জন্য কোথাও স্থান না-পেয়ে সে আত্মহত্যা করে। প্রেসিডেন্সি কলেজের পিয়োন, পড়াশোনা করে জীবন বদলাতে চেয়েছিল কিন্তু ঘটনাচক্রে তার পরীক্ষা দেওয়াই হল না!

এই চরিত্রগুলির আত্মহত্যার কারণ হিসেবে দেখা যায় বাইরের পরিবেশের রূঢ়তায়, উন্নাসিকতায়, বিধ্বস্ত হয়ে তারা যে-প্রতিবাদ বা ক্ষোভ জানিয়েছিল, তার পাত্র হল তারা নিজেরাই। নিজের মৃত্যু তারা হয়তো চায়নি, কিন্তু তাদের ক্ষোভ ও প্রচণ্ড ক্রোধের পাত্র তারা খুঁজে পায়নি। তারা হাতের কাছে শুধু নিজের অস্তিত্বকেই পেয়েছে। অর্থাৎ বাইরের দিকে, সামাজিক অপব্যবস্থার দিকে তারা তাদের বিধ্বস্ত ক্ষোভকে ছড়াতে পারেনি তাই তারা আত্মহননে নিঃশেষ হয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে, ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যায় তাদের আচরণের কার্যকারণ সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়।

নাটকের শেষপর্বে ষষ্ঠ চরিত্র পাগলের গান শুনে আত্মহত্যার নায়করা উপলব্ধি করে, তাদের আত্মহত্যার মূল সূত্রটি। পাগলের গান ছিল : 'আমি একলা চলেছি ভবে'। অর্থাৎ

তারা প্রত্যেকে একলা হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হলে, লড়াইয়ের মনোভাব জোট বাঁধলে হয়তো তাদের আত্মহত্যার পথে যেতে হত না। স্লোগানধর্মী সংলাপে শেষ পর্বটি ভরা থাকলেও এই জটিল সমস্যার সমাধানের যে-ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই এমিল ডার্কহাইমের তত্ত্বকে সমর্থন করে, অর্থাৎ সামাজিক তথা মানবিক গোষ্ঠীতে আবদ্ধ থাকলে, মানুষের নিজের জীবনকে অসহায় বলে মনে হয় না।

সংহিতা ঘটক

সে বিষ্ণুপ্রিয়া

১৯৭৪ সালে ঋত্বিক ঘটক একটি নাটক লিখেছিলেন 'জ্বলন্ত'—একটি সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। পশ্চিমবঙ্গে তখন বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। খবরের কাগজে সব সত্য ঘটনা ছাপা হয় না। এই খবরটিও অন্যভাবে বেরিয়েছিল। উনি নিজের উদ্যোগে আসল ঘটনা জেনে লিখেছিলেন এই নাটক।

নাটক দিয়েই ঋত্বিক ঘটকের জীবন শুরু হয়েছিল। তখন 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' ও তিতাসের shooting & editing হয়ে গেছে। দুটো ছবিই complete। এই শেষ ছবি দুটির এ দেশে মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। আমি আর বাবা দিল্লি ও বোম্বাই গিয়ে ছবিটি release-এর চেষ্টা কবছিলাম।

সৃষ্টিশীল মন কখনও বসে থাকে না। তাই এল নাটক। আসলে এই গল্পটা নিয়ে বাবা একটা ছবি তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমে ঠিক হল নাটক হবে।

একদিন নাটকের মহড়া দেখতে গিয়েছি। Casting হচ্ছে—নতুন ছেলে-মেয়েরা এসেছে। পুরোনোদের মধ্যে অমল (কর) কাকা ও অমলেশ (চ্যাটার্জি) কাকা ছিলেন। একদিন একটি মেয়ে এল বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে অভিনয় করতে। কিন্তু বাবা যতবার দেখিয়ে দিচ্ছেন, কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না। রেগে যাওয়া, বকুনি সব হচ্ছে। শেষে মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেল। এখন সমস্যা—কে করবে? হঠাৎ আমাকে বললেন, টুনুমা ওঠ তো, তোকেই করতে হবে। আমি তো অবাক। আমি ছোটোবেলা থেকেই নাচ শিখেছিলাম। এই নাটকে প্রচুর গান আছে এবং তার সঙ্গে নাচ। আমি তো উঠলাম। প্রথমে শেখালেন কী করে হাঁটতে হয়। বললেন ইসাডোর ডানকানের মতো পা-টা টো-এর ওপর চেপে চেপে হাঁটতে হবে। তার পরে দেখালেন কী করে তাকাতে হবে। প্রত্যেককেই দেখিয়ে দিচ্ছেন কতখানি হাঁটতে হবে, কোথায় ঘুরতে হবে। আমার সঙ্গে একজন সখীর চরিত্র ছিল। তাকে হাত ধরে কীভাবে ঘুরে ঘুরে কথা বলতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছেন। আমাকে কিন্তু দূরে বসে বলে যেতেন এভাবে করো, এদিকে তাকাও, ওদিকে তাকাও। আস্তে আস্তে আমার গলা খুলে গেল। বললেন, পুরো পার্ট মুখস্থ করে আসবে। সেটাও করে ফেললাম।

আমাকে মাঝে মাঝে খুব সমালোচনা করতেন। চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালে বলতেন, কী বড়ো বড়ো চোখ করে বোয়াল মাছের মতো তাকাচ্ছ? আমার চোখে চশমা আছে। খালি চোখে বেশিক্ষণ তাকালে কষ্ট হয়। একদিন মহড়া চলছে। আমি কথা বলতে বলতে ওপরের দিকে মুখটা তুলে কথা বলছিলাম। আমাকে বললেন, ওপরের দিকে মুখ তুলে কথা বলছ কেন? দর্শক কি তোমার chin দেখবে? আমি রেগে গিয়ে বলে উঠলাম—আমি করব না যাও, বলে বসে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর গলা—শোনো, এখানে আমি তোমার বাবা না। আমি Director। আমি যা বলব তাই করবে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার উঠলাম। তখন বুঝতাম না। বাবা আর Director, এই দুই চরিত্রে কী অসম্ভব পার্থক্য। এখন বুঝি, অবাক লাগে। ছেলেদের দেখিয়ে দিতেন কীভাবে Hamlet-এর মতো হাঁটবে। নিজেদের ব্যক্তিত্ব তৈরি করবে। সবদিকেই তীক্ষ্ণ নজর।

নাটকে আমি বিষ্ণুপ্রিয়া। একটা দৃশ্যে আমার সঙ্গে পূর্ব পরিচিত সুশোভনের দেখা। বিষ্ণুপ্রিয়া বড়ো হয়েছে—দুজনের কথোপকথনের দৃশ্য—আমাদের দুজনকে centre stage থেকে কথা বলতে বলতে বাঁদিকের front stage-এ আসতে হবে। আমাকে দেখিয়ে দিলেন—কখন কথা বলবে, একটা আঙুল নাকের ওপর রেখে ঘাড় এলিয়ে কথা বলবে, এইভাবে এগিয়ে যাবে যেন কথা বলছ অবজ্ঞা করে। তখন বুঝতাম না, এখন বুঝি এইভাবে কাজের সঙ্গে মিশে না-গেলে কোনো কাজ হয় না। কত সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি বুঝিয়ে দিতেন। অভিনয় নিয়ে কত কথা বলতেন।

'জ্বলন্ত' নাটক করার সময় বহু পথ পেরিয়ে এসেছেন, শরীর ভেঙে গেছে, ক্লান্ত। দুটো বড়ো ছবি করার পর পরিশ্রান্ত ও হতাশা। একদিন নাটকের মহড়ায় যাব। দেখি ঘুমিয়ে পড়েছেন। দেরি হয়ে গেছে, সবাই অপেক্ষা করছে—আমাকে বললেন, তুই গিয়ে বল বাবা আসছে। দেরি করে এসে বললেন আমি দুঃখিত, আমার ঠিক সময়ে আসা উচিত ছিল। 'কোমল গান্ধার'-এর কথা মনে পড়ল। নাটক যৌথ উদ্যোগে—সবাইকে নিয়ে চলতে হয়। Director নিজে সবসময় disciplined থাকবে। এই ছিল তাঁর চিন্তাধারা।

এই নাটকের উদ্দেশ্য ছিল—এ নাটক ভাঙাই নাটকের কাজ, Brecht-এর theory follow করে। একটি দৃশ্য শেষ হলে আরেক দৃশ্যের আগে দেখা যেত কিছু 'বলা' আছে।

নাটকের বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই নাটকে প্রচুর গান ছিল। নিজেই লিখেছেন। নিজেই সুর দিয়েছেন। এইরকম একটি গান—

কোথায় একটা ভালো দেশ আছে
যেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে
সে দেশ কোথায় জানি না
কিন্তু তার কথা মনে আসে।
একদিন এই পৃথিবীটা সুন্দর হবেই
মানুষ মানুষকে ভালোবাসবেই
কত হাজার বছর পর জানা নেই
কিন্তু জানা আছে এর কোনো মার্জনা নেই—

সেদিনের জন্য আমি টিকে আছি
সেই দিনটা আসার জন্য আমি ভালোবাসছি।

'বিষ্ণুপ্রিয়া'। গ্রামের একটি সরল মেয়ে, কিন্তু ভেতরে অসম্ভব তেজ। প্রথম দিকের দৃশ্য থেকে ক্রমশ চরিত্রটি কঠিন হতে থাকে। মেয়েটি শেষে চারজন যুবক দ্বারা ধর্ষিত হবে এবং তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে, তাই নাটকটি 'জ্বলন্ত'। বাবা বলতেন, বিষ্ণুপ্রিয়া, মানে তোর মুখটা screen-এ চলে যাবে মরবার সময়, যখন দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করছে, রিপোর্টার সুশোভন এসে গেছে—"মাগো তুমি যে মরছ. আসল পার্টিরা ফুটে গেছে—মাঝখান থেকে আমি বেচারা মারা যাব", তুমি বলবে "এত পাপ কাদের জন্য। কে দায়ী? কে দায়ী? কে দায়ী?" মরবার সময় তুই, মানে তোর মুখটা (big close-up)-দর্শকের দিকে থুথু ছেটাচ্ছিস—মানে আপনারা দায়ী। কিন্তু সেটা আর করা হয়নি। ভাবা হয়েছিল, লেখা হয়েছিল।

যে-পরিবেশে ও আর্থিক অবস্থায় নাটক শুরু হয়, সেভাবে করা যায়নি। কিন্তু দিনের পর দিন এবং রাতেও মানে whole night, স্টার থিয়েটারে ড্রেস রিহার্সাল হয়েছে। বাবা এত খেটেও ঠিক সন্তুষ্ট হননি। সবাই মনপ্রাণ দিয়ে অভিনয় করেছিল। নাটককে একতারে বেঁধে রাখতে হয়। কিন্তু অনেক ওঠাপড়ার দৃশ্য থাকে curve-এর মতো। এ নাটক সমসাময়িক সমস্যার প্রেক্ষাপটে লেখা। আজও এ সমস্যা বর্তমান। বেকার যুবক, তাদের হতাশা—তাদের নিজস্ব চারিত্রিক গুণ থাকা সত্ত্বেও তারা আজ সমাজবিরোধী, কোনো মূল্যবোধ নেই। বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রায়নে বাবা চেয়েছিলেন পৌরাণিক চরিত্র ও আধুনিক চরিত্রের মিশ্রণ। বিষ্ণুপ্রিয়াকে কেন চারজন ধর্ষণ করে মেরেছিল? এই সমাজ ও এই বাংলা আজ জ্বলছে। পৌরাণিক ও আধুনিক চরিত্র ও কাহিনি নিয়ে film-এর synopsis লেখা আছে। নাটকের মূল চরিত্রগুলো আজও এ সমাজে বাস করছে। এরই মধ্যে বাবা দেখাতে চেয়েছিলেন—ছিন্নমূল পরিবার ও তার পরিণতি।

সংস্কৃত শ্লোক, পুরাণ আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য। তাঁর সব কাজের মধ্যেই এক সুর বেজেছে। এই চিন্তা বহন করে নিয়ে যেতে হবে আজকের যুবসমাজকে। মানুষকে ভাবাতে চেয়েছিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া ধর্ষিত হওয়ার পর বাবা রেখেছিলেন চারজন যুবক ও দারোগাও নাচছে—green tarrentulla dance—আফ্রিকার সবুজ মাকড়সার মৃত্যুর নাচ—এখন নাচতে হবে সুস্থ নাচ। নাটকের উপস্থাপনা হয়তো খুব উচ্চমানের হয়নি। নাটকটি Academy of Fine Arts-এ মঞ্চস্থ হয়েছিল। আমাকে নাটকের আগে green room-এ এসে বলেছিলেন—"একদম Make up করবে না—পারলে মুখে কালো রঙ মাখো—বলেছিলেন সরলতাও সৌন্দর্য, সেটা জানো না।" সেটা জীবন দিয়ে বুঝেছি, আমি যখন stage-এ উঠি বাইরের জগৎ সব ভুলে যাই। এই নাটকে অভিনয় বাবার সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ অভিনয়। নাটক শেষ হওয়ার পর খুব প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন তুমি তো বেশ ভালো করেছ—সবাই তোমার নাম করছে। বাবা বলতেন, stage-টাকে ওপর থেকে দেখবে, তাহলেই দেখবে পুরো নাটকটা set-lighting-music-

dialogue-acting সব মাথার মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এভাবে এখন আর কে বোঝাবে? অভিনয় কী? নাটকের প্রয়োজনীয়তা কী? প্রতিটি জিনিস মাথায় রেখে নিজের চিন্তাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ প্রয়োজন।

আমি আশা করব নাটকটি আবার মঞ্চস্থ হবে। তাহলে মনেপ্রাণে খুশি হব। গুছিয়ে লিখতে পারলাম না। যখন যেরকম মনে এল, তাই লিখলাম।

স্মরণ করি এঁর স্রষ্টাকে, যিনি এখনও ভীষণ ভীষণভাবে জীবিত।

ঋতবান ঘটক

সুরে বেসুরে অযান্ত্রিক

হৈ রে হৈ মারহাট্টা
গালপাট্টা
আঁটসাট্টা।

হাড়কাট্টা ক্যাঁ কোঁ কীচ্
গড়্ গড়্ গড়্ গড়্।....
হুড্ডুদুম্ দুদ্দাড়
ডান্ডা
ধপাৎ
ঠান্ডা
কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার।

জগদ্দল যখন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ায় তখন তার আগমনবার্তার যে-আবহ সেটা এই কবিতাটা মনে করিয়ে দেয় না কি?

জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ 'সে' লেখাটি লিখেছিলেন। চলচ্চিত্রজীবনের প্রায় শুরুতে বাংলা সিনেমার 'ব্রহ্মাণ্ডে সেই প্রথম ছাড়া পেল দুর্জয়শক্তিমান বেসুর প্রবাহ— 'গোঁ গোঁ গাঁ গাঁ হুড়মুড় দুর্দাড় গড়্ গড়্ ঘড়্ ঘড়্ ঘড়াৎ'—সৃষ্টি করলেন ঋত্বিককুমার ঘটক।

একজন বলছেন তার,

ফসল কাটার পরে
শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে।

আরেকজনের ফসল ফলার শুরুতেই এই বেসুর।

বাংলা সাহিত্যের চৌহদ্দির মধ্যে ছিল না যে-বিষয় তাকে গল্পে এনে হাজির করলেন সুবোধ ঘোষ। আর বাংলা চলচ্চিত্র যেখানে আগের কালে তো কখনোই নয়, আজ অবধি এমন একটা বিষয় পেল না, যেটা 'অযান্ত্রিক' এ রয়েছে।

পনেরো বছর ধরে যে-ভাবনার বীজ ছিল পরিচালকের মণিকোঠায় তাকে রূপান্তরিত করলেন নতুন সিনেমার ভাষায়। পেল না দর্শক-সমাদর।

রামকিঙ্কর বলেছেন সৎ শিল্পী কখনও দর্শকের অপেক্ষা করে না। দর্শক মিথ্যা, শিল্পী সত্য।

তিনি আরও বলেছেন,

আর্ট একধরনের চ্যালেঞ্জ। বিশাল ঝুঁকি। জীবনের কুৎসিত নগ্নতা, সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সৃজনশীল প্রাণবন্ততার চ্যালেঞ্জ, এই চ্যালেঞ্জ এবং তার প্রতিক্রিয়া একজাতের খেলা। শিল্পের খেলা। হারজিতটা বড়ো কথা নয়। আজকের হার আগামীকালের জয় বলেও চিহ্নিত হতে পারে। অথবা বিপরীতও সত্য। খেলাটাই আসল। এই খেলা যে পূর্ণ আস্থা নিয়ে খেলতে পারবে সেই শিল্পী।

'অয়নান্ত' গল্প দিয়ে যার শুরু হয়েছিল শিল্পের যাত্রা, সেই শিল্পী কত ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন নিজের সম্পূর্ণ মৌলিক ভাবনাকে। দিলেন নতুন আঙ্গিক, নতুন সিনেমার ভাষা, সর্বোপরি ইঙ্গিত দিলেন নতুন এক সভ্যতার জন্মের, আমাদের বাঙালি জাতির কাছে।

রামকিঙ্করের আরেকটি উক্তি গ্রহণ করব,

কোনো স্কুল অব আর্ট-এর যোগ্য উত্তরসূরি বা অন্য কারোর মতো ছবি আঁকা—এসব করলে আমি নিজে শিল্পী হিসাবে স্বতন্ত্র চিহ্নিত করতে পারব না। এক্ষেত্রে আমাকে স্বার্থপর হতেই হবে। সেই সময় আমি সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখতাম কোন্ আঙ্গিক বা মিডিয়াম, কোন্ বিষয়, কোন্ শৈলী এখনও ব্যবহৃত হয়নি। শিল্পের কোন্ অঞ্চলে এখনও একটিও আঁচড় পড়েনি।

ঋত্বিককুমার কোথাও বলেননি উনি স্বতন্ত্র। কিন্তু দুজনের শিল্পভাবনায় কোথায় যেন এ উক্তিটির মিল পাই।

তাঁর সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির দিকে তাকালে দেখতে পাই তাঁর শ্রদ্ধা পূর্বসূরিদের প্রতি ও তাঁর সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে একসাথে শিল্প নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। নিজেকে স্বতন্ত্র করার চেষ্টা করেননি জোর করে। সরলভাবে নিজের অন্তর্চিন্তাকে উন্মোচিত করেছেন।

যে-শাশ্বত ভাবনায় উনি উদ্‌বুদ্ধ তার প্রতিটি স্তর ছুঁয়ে যান এই গল্পে। প্রথম যৌবনের উন্মেষে যে উদ্‌বেল ও দ্বিধান্বিত মন থাকে তা 'অয়নান্ত'-এ থাকলেও তার আরেকটা মাত্রা যোগ পায় 'আকাশগঙ্গার স্রোত ধরে'-তে। মনের এই আশঙ্কা থেকে যায় যদি সেই বোধের পরম প্রাপ্তি হাতছাড়া হয়ে যায়। 'এক্সট্যাসি' গল্পটিও শেষ হয় মনের এই দোদুল্যমানতা নিয়ে। আমরা খুব সহজেই বিষয়ের এক সমাপতন দেখাতে পারি 'এক্সট্যাসি'-র সঙ্গে 'অযান্ত্রিক'-এর। 'অযান্ত্রিক'-এর সঙ্গে ভাবের কোথায় এক মিল রয়েছে 'পরশপাথর' আর 'প্রেম' গল্পের। বিমলের যে-জেদ তার সঙ্গে মিল পাই পরশপাথর-সন্ধানী ওই মানুষটির। আর বিমলের প্রেমের যে-আকুতি তার সঙ্গে মিল দেখি পরিণত প্রেম-চিন্তা ওনার অনেক পরের 'প্রেম' শিরোনামের গল্পটিতে।

'দলিল' নাটকে একটা মৌলিক চিন্তা আনলেন নাট্যজগতে। কিন্তু তার বিষয় যেখানে কাল, তাকে ধরে রাখতে সারাজীবন অন্বেষণ করে গেলেন দেশভাগের মর্মান্তিক ব্যথাকে। তাঁর 'জ্বালা' থেকে শেষ জীবনের 'জ্বলন্ত' অবধি ক্রম-উত্তরণ দেখি আন্তর্জাতিক নাট্যধারার সাথে।

চলচ্চিত্রেই তাঁর স্বাতন্ত্র পুরোপুরি প্রকাশিত হল একেবারে গোড়ার কাজ থেকে। আমার বিশ্বাস 'বেদেনী' যদি আমরা দেখতে পেতাম তবে এই চিত্রটিকেই 'অযান্ত্রিক'-এর পূর্বসূরি প্রকৃতপক্ষে বলা যেত। প্রত্যন্ত জীবনের যে-নিগূঢ় রসের আস্বাদন আমরা পাই 'অযান্ত্রিক'-এ, 'বেদেনী' হলে সেটা আমরা অনেক আগেই পেতাম।

'নাগরিক' বাংলা চিত্রের প্রকৃত পথিকৃৎ কি না এ বিতর্কে আমি যাব না। একটা জিনিস পরিষ্কার 'নাগরিক'-এ উনি সিনেমার ভাষায় কথা বলেছেন, তার সাথে মিল নেই আগের বা পরের বাংলা চলচ্চিত্রের। নতুন আঙ্গিকের কথা যদি বলেন তবে 'নাগরিক'-এর দুপুর স্মরণ করুন। ওই একটা সিকোয়েন্সেই তিনি প্রমাণিত করলেন ওনার হাতে নতুন শিল্পশৈলী দেবার অস্ত্র আছে। সেটা যেমন চিত্ররূপে সেরকম আবহে।

'অযান্ত্রিক'-এর মাথা থেকে পা পর্যন্ত নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষানিরীক্ষা, যা প্রতিটি ইঞ্চি মেপে মেপে করা। এত গবেষণা, এত সেটপাট, এত নতুন আবহের মিশ্রণ, ক্যামেরায় নতুন ভাষায় কথা বলা আর কোনো চিত্রে উনি এর পরেও করেননি।

মোটকথা এই কথাটাই ঘোষণা করা হল আমাদের কাছে যে, ঋত্বিককুমার শেষ অবধি একজন সার্থক চিত্রস্রষ্টা। তাঁর সমগ্র শিল্পভাবনাও যদি আমরা তলিয়ে দেখি তবে দেখব তাঁর সমস্ত ভাবনার নির্যাস ওই চলচ্চিত্রেই এসেছে। এটাই ছিল তাঁর মাধ্যম। রামকিঙ্করের ভাবনা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি এ জন্যই যে, তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ কম হলেও দুজনের সম্পর্ক ছিল নিবিড়।

স্থাপত্যের চিত্ররূপ হয় না, এরকম কথা অনেকে বলে থাকেন। রামকিঙ্কর বলেছেন যে, পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার ওনার কখনও ইচ্ছেই হয়নি (প্রসঙ্গত ঋত্বিককুমার কখনও পাশ্চাত্য দেশে যাননি) কারণ ভাস্কর্যের সব নিদর্শন ছবি দেখেই তাঁর পাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আর চিত্রে যে ভাস্কর্য ভালোই আসে এ কথা রামকিঙ্কর নিজেই বলেছেন। নইলে ভেবে দেখুন তো ঋত্বিককুমারের সমস্ত চিত্রকর্মই একসময় বিবর্ণ প্রিন্ট-এর মাধ্যমে দেখতে হত। তাতে কি ওনার চিত্রের সমঝদার সে যুগে কম ছিল? জর্জ সাঁদুল তো একটা unsubtitled প্রিন্ট দেখেছিলেন 'অযান্ত্রিক'-এর। আর সেই দেখাই হল 'অযান্ত্রিক'-এর আন্তর্জাতিক খ্যাতির মূল ধাপ।

'অযান্ত্রিক'-এ বিমলের কিছু কিছু দৃশ্যে মনে হয় লোকটা যেন এক-একটা ভাস্কর্য হয়ে উঠেছে। রাঁচি-নেতারহাটের রুক্ষ অথচ কোমল প্রকৃতির প্রতিটি নির্যাস যেন ওর শরীরে ভাষা পাচ্ছে। স্বয়ং পরিচালককে দেখতে পাই কোথাও কোথাও ওর মধ্যে। আর জগদ্দল তো প্রতিটি দৃশ্যেই জ্যান্ত বলে মনে হয়। চিত্রকর তো তাকে নিজের মা-র সঙ্গেই তুলনা করে বসলেন। সাজিয়েগুছিয়ে টাঙিয়ে দিলেন একেবারে বসুশ্রী সিনেমার ওপরে। নতুন প্রাণ দিলেন চড়ুই পাখির বাসা এনে হাজির করে জগদ্দলের ভেতর। যেন রূপককে দিলেন প্রাণ।

জীবনের প্রায় দশ-এগারো বছর কাটিয়েছেন আদিবাসীদের মধ্যে চিত্রকর। প্রথমে ১২ বছর বয়সে গোবিন্দপুর ও পরে ১৪ বছর বয়সে চিরিমিরিতে (মধ্যপ্রদেশে) নিজের মেজদির কাছে। এরপর ১৯৫৫-র সময় তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য ছোটোনাগপুর ও বিহার যান। ২২.২.৫৫ তারিখে নিজের স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে এরকম পাই,

"রাচিতে এই কয়দিন উর্ধ্বশ্বাসে কাজ করে যেতে হয়েছে। কিন্তু কী আনন্দের কাজ, কী করে বোঝাব তোমাকে। ওরাওঁ আর মুণ্ডাদের মধ্যে সারাদিন কাটছে, মাটির স্বাদ পাচ্ছি, অপূর্ব গানের সুর আর মাতাল করা নাচের ছন্দ অহর্নিশি, ওদের নিপীড়িত জীবনের মধ্যে বাঁচার আকুলতা, এসব আমায় ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। এ বাস্তবের কণামাত্র নিয়ে যেতে পারছি সঙ্গে করে, কিন্তু তাতেই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে—মানুষকে বুঁদ করে দিতে পারব। যা আমি নিয়ে গেলাম তাতে কর্তারা খুশি হবেন, দর্শক খুশি হবে, কিন্তু আমার অতৃপ্তি কাটবে না। আমি তো জানি, বিরাট ঐশ্বর্য ভাণ্ডার আমার সামনে খোলা রয়েছে, তার বিন্দুমাত্র আমি ধরতে পারলাম। ইচ্ছে হচ্ছে, আবার আসব, আরও বড়ো, আরও বাস্তবপূর্ণ, আরও ব্যাপক ছবি করব। হয়তো করা হবে না আমার জীবনে, তবু ইচ্ছে হচ্ছে।"

এই বিরাট আশাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রশান্ত লাহিড়ি ও প্রমোদ লাহিড়ি। লাহিড়ি পরিবারের সঙ্গে চিত্রকরের সম্পর্ক সেই চিরিমিরি যুগের থেকে। ওনাদের এস্টেট ছিল চিরিমিরিতে। তাঁদের পরপর 'পরশপাথর', 'লৌহকপাট' ও 'অযান্ত্রিক' চিত্র প্রযোজনা আজ বাংলা চিত্রের জগতে এক ইতিহাস। এনাদের কেউ আবার কী করে 'অযান্ত্রিক'-এর টাইটেলটা বিলুপ্ত করলেন সেটা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে বই-কি। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর কোনোদিন সেই অসমান্য টাইটেল মিউজিক শুনতে পাবে না। শুনেছি সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, রমেশ যোশী-র কাছে, অনবদ্য শব্দ সমন্বয় করেছিলেন এই টাইটেলে চিত্রকর।

আমার যে-বিষয় নিয়ে এই আলেখ্যর উত্থাপন তা হচ্ছে 'অযান্ত্রিক'-এর শব্দ। টাইটেল মিউজিকেই যেখানে মূল শব্দের সমন্বয় তাকে বাদ দিলে চিত্রের অর্ধেক কথাই বলা হয় না। এই চিত্রের সংগীতের একটা প্রধান দিক হচ্ছে ওরাওঁ সংগীত। এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি সংগীত মূল চিত্রনাট্যে আগে থেকেই লেখা ছিল। চিত্রকরের ওরাওঁ সংগীত সম্বন্ধে ধারণা আমরা তাঁর On Oraons of Chhotonagpur লেখাটিতে পাই।

রামকিঙ্করের একটি উক্তি গ্রহণ করব,

"গতি আর ঘর্ষণের মধ্যে বৈরীভাব আছে। গতি যত তেজবান, ততই কর্কশ। এর মধ্যে যেখানে সুসম্বন্ধ, সেখানেই সংগীতের উদ্ভব। সুরস্রষ্টা ছ'টি স্বরে শব্দের বিশ্লেষণ সমাপ্ত করেছেন। স্বর-শিল্পীর ভাগ-বিশ্লেষণ অতি প্রাচীন। ছটি স্বরের বিজ্ঞান দিয়ে আমাদের সব কিছু আবেগ-অনুরাগ-অনুভূতির প্রকাশ হয়ে চলেছে।"

গতির সঙ্গে ঘর্ষণ শুরু। তার থেকেই শব্দ। ঘর্ষণের তারতম্য অনুসারে কোনোটা কর্কশ, কোনোটা মধুর। সুরস্রষ্টা তা-ই নিয়ে অদ্ভুত সুর রচনা করেন, ধরে রাখার চেষ্টা করেন। দেখি সর্বত্রই সেই খেলা।

চিত্রের প্রথম দৃশ্যেই আবহে আসে ওরাওঁ রমণীদের সমবেত গান, মামা-ভাগ্নে যখন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আসে। গৌর মিস্ত্রির দোকানে ওরা যখন এসে বসে তখন আবহসংগীত

জোরে শোনা যায়। মহিলাকণ্ঠের সঙ্গে যুক্ত হয় পুরুষকণ্ঠ, আর মাদলের শব্দ। মামা সুলতানের সঙ্গে কবরস্থানে যখন প্রবেশ করে তখন আবহে একক এক মহিলার কণ্ঠ শোনা যাবে আর গির্জার ঘণ্টার আওয়াজ। এক ওরাওঁ মহিলার বিলাপ তার প্রয়াত শিশুর প্রতি, এই দৃশ্য আমরা দেখব এ চিত্রের একেবারে শেষে যখন বিমল জগদ্দলকে নতুন করে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করবে। এখানে সেই মহিলাকণ্ঠের সূচনা হল। জগদ্দলের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ঢোকার সময় যে-আবহসংগীত তার ব্যাখ্যা আলোচনার শুরুতেই করেছি। বুলাকি পাগলেব সামনে দিয়ে জল ছিটিয়ে (বর্ষাকাল বোঝানোব জন্য) জগদ্দল যখন রওয়ানা দেয় তখন চিত্রের থিম মিউজিক শুরু হয়।

এ চিত্রের আবহসংগীত ব্যাখ্যা করার জন্য অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য (সংগীত রিসার্চ আকাদেমি-র স্নাতক) সাহায্য চেয়েছিলেন। তিনি নিম্নরূপ ব্যাখ্যাটি কবে দিয়েছেন,

"এক চপল আদিম আদিবাসী সুর দিয়ে শুরু। এ সুরকে সরোদে পরিমার্জিত করে সাজানো হয়েছে। এ সুর এক আনন্দের রেশ ধরে রাখে যা দিয়ে এ গল্পের শুরু।"

ঝরনার কাছে যখন জগদ্দল এসে পড়ে, আবহসংগীত থেকে জগদ্দলের ইঞ্জিনের শব্দের মিশ্রণ ঘটে। এরপর থেকে পুরো সিনটাই শুধু গাড়ির বিভিন্ন শব্দের সমাহার।

জগদ্দল যখন গ্রামে পৌঁছোয় তখন পুরো দৃশ্যটায় শুধু বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ। শুধু জল পড়ার শব্দের এই বিচিত্র ব্যবহার আমরা 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ দেখেছি।

আবার রওয়ানা দেয় বিমল। এখন পর্যন্ত আবহে ছিল ব্যঙ্গ আর চপলতার স্ফুরণ, এবার পাব রাগ যোগীয়াকে।

অনিরুদ্ধর ব্যাখ্যা,

সেতারে রাগ যোগীয়াতে যে সুর ফুটে ওঠে তার মধ্যে দুই সত্তাব একাত্মতা মূর্ত হয়ে উঠেছে (জগদ্দল আর বিমলের)।

বিমল গাড়ি মোছে। পাখির ডাক শোনা যায়। বিমল বলে, 'আকাশের পাখী পর্যন্ত হিংসে করে (জগদ্দলকে)।' প্যারা সিং-এর দল আসে। তারা বলে, 'কি ব্যাপার বিমলবাবু, ভাঙা মন্দিরে চুনকাম হচ্ছে!' এই সময় আবহে একটা সংগীত বাজে সেতারে, যেটাকে পারিবারিক নিমগ্নতা অর্থাৎ বিমল-জগদ্দল এবং এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের লোকেদের একসাথে ওঠাবসা করার ব্যাখ্যা হিসেবে আমরা ধরতে পারি।

সুলতান আসে। বিমলকে বলে, সে বেড়াতে যাবে। বিমল রাজি হয়। বিমল বলে সে একটা ফটো তুলবে জগদ্দলকে নিয়ে।

জগদ্দল যখন স্ট্যান্ডে আসে একেবারে সাফসুফ হয়ে তখন বিমলকে আমরা দেখি নতুন পাঞ্জাবি ও কোঁচামারা ধুতি পরে সে ফটো তুলতে এসেছে নিত্য-র কাছে। এখানে বিমলের অভিব্যক্তি ও সঙ্গের আবহসংগীতে আগের সিনের মামা-ভাগ্নের বিবাহযাত্রার প্রতি একটা ব্যঙ্গ থাকে। এরপর আসে আদিবাসী সুর, যখন আমরা একদল ওরাওঁ পুরুষ-রমণীকে দেখি। হাসি আর দীপক যখন স্ট্যান্ডে ঢোকে তখন একটা কম্পোজিশন সংগীত শোনা যায়।

অনিরুদ্ধর ব্যাখ্যা,

"চপল ও আদিম সুরের মাধ্যমে বিমল ও জগদ্দলের একসাথে চলার যে ছন্দ তা ফুটে ওঠে, সুরের আদিমতা বহুযুগ আগের জীবনচর্যার এক অন্তরঙ্গতা মনে করিয়ে দেয় যার স্থূলতা (cruelty) আদিবাসী জীবনে আমরা পাই। পরে সেই সুর পরিশীলিত হয়ে ওঠে এক নববধূর আগমনে, বিমলের জীবনের রুক্ষ ছন্দে যেন এক কোমলতার আস্বাদন পাওয়া যায়,

গ ম প প ম গ ম ঽম গ সা গ সা সা সা
গ ম নি প প নি প গ ম ম গ সা গ সা সা সা।

অনিরুদ্ধ এর পরের সংগীত সম্পর্কে বলছেন,

"আমাদের সমাজের দ্বারা সৃষ্ট সবচেয়ে পবিত্র বন্ধন হল বিবাহ, যে বিবাহের মাধ্যমে দুটি সত্তা আজীবন বাঁধা থাকে। অথচ সত্যিকারের জীবনে এর মূল্যায়ন কি যথাযথ হয়? হয় না, কারণ এ বন্ধনে আবদ্ধ যে দুটি সত্তা, তাদের কাছে এ বন্ধনের চেয়ে তার প্রয়োজন ও তার অনুষঙ্গ বড়ো হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যখন বিমলের ও জগদ্দলের আসক্তির প্রশ্ন, তার কাছে আমাদের সমাজ-আরোপিত এ বন্ধন এতটাই ছোটো হয়ে পড়ে যে তা কেবল এক ব্যঙ্গের ও উপহাসের যোগ্য হয়ে ওঠে। তাই এ সুরের মূর্ছনা প্রথমে ব্যঙ্গাত্মক ও পরে সে ব্যঙ্গের অন্তর্গত কারুণ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

গঙ্গাপদ বসু ও অনিল চ্যাটার্জি দুজনের সান্নিধ্যই যেন জগদ্দলের কাছে কাম্য নয়। কারণ এরা দুজনেই বস্তুতন্ত্রভিত্তিক সমাজজীবনের মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী। আবহমান কাল থেকে বাহিত জীবনের যে স্রোত সে স্রোতের প্রাণ সঞ্চারিত হয় ভালোবাসা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে, এ স্রোত এক ছন্দবদ্ধতা লাভ করে দুটি সত্তার একে অপরের প্রতি নিবিড় বন্ধনের মাধ্যমে, যেন দুটি সুতা অসীম সময়ের পরপারের কোনো এক বিন্দু থেকে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আজ অবধি নিজেদের ধরে রেখেছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। এ স্রোতের ক্ষয় আছে, কিন্তু বিনাশ নেই, এ প্রবাহ তার পারিপার্শ্বিকতার ওপর বিজয়প্রাপ্ত হয়ে অসীমকাল হতে আজ অবধি চলে আসছে। এ সুরমূর্ছনায় সেই অজানা সময়ের এক মাদকতার আস্বাদ পাওয়া যায়, যা তার প্রাচীনত্বে অমোঘ হয়েও যেন নবীনতায় সুচিক্কন।

এরপর জগদ্দল যাত্রা করে। যখন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে জগদ্দল মেঠো রাস্তায় চলে তখন মূল থিম সংগীত ফিরে আসে একটু পরিবর্তিত রূপে।

অনিরুদ্ধর ব্যাখ্যা,

"মেয়েটির উচ্ছলতা, চাপল্য, মুক্ত জীবনের স্বপ্নকে ঘিরে যে সুর বাজে তা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে সেই আদিম মায়ার কথা, সেই স্রোতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয যা কিনা আমাদের আবহমান কাল থেকে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।"

মেয়েটির এই পেলব উপস্থিতি বিমলের মনেও এক স্বপ্নের ছোঁয়া দিয়ে যায়, যা খামাজ রাগে প্রকটিত হয়। মেয়েটির জীবনের স্বপ্ন জলতরঙ্গের ব্যঞ্জনায় প্রাণ পায়, কিন্তু গির্জার ঘণ্টাধ্বনি আমাদের পাশ্চাত্য দ্বারা প্রভাবিত বস্তুতন্ত্রভিত্তিক সমাজের যান্ত্রিক

জীবনধারণের মূল মন্ত্রের কথা স্মরণ করায় যার নিষ্ঠুর পেষণে মেয়েটির স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা মুমূর্ষু হয়ে পড়ে, ও তার কবলে সে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়।

জগদ্দল ছোটোনাগপুরের মালভূমি দিয়ে ছুটে চলে।

থিম মিউজিক শেষ হলে মাদলের শব্দ ধীরে ধীরে দূরের উপত্যকা থেকে ভেসে আসে। পরের দৃশ্যে দেখি পারহা পতাকা উদ্যত করে ওরাওঁরা চলেছে। মাদলের শব্দ মিশে যায় আবার থিম মিউজিকের সঙ্গে। বিমলের গাড়ি আদিবাসী বাজারের দিকে এগোয়। হাসি জগদ্দলের ছেঁড়া হুডটা দিয়ে মুক্ত আকাশ দেখতে পায়। বাজারে গাড়ি থামলে অনিল হাসির জন্য একটা কাঁকুই কেনে। হাসি মনের আনন্দে স্বল্প ছেঁড়া হুডটাকে আরও ছিঁড়ে ফেলে। বিমল দেখে কিন্তু কিছু বলে না। সমবেত ঝুমুরের শব্দ বাড়তে থাকে। মাদলের শব্দ।

জগদ্দল ডাকবাংলোয় পৌঁছোয়। সুলতান, অনিল গাড়ি থেকে নামে। হাসি গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই আবহে সংগীত শুরু হয় (যার ব্যাখ্যা অনিরুদ্ধ এর আগেই করেছেন।) বিমল-হাসির একটা সম্পর্ক শুরু হয়, যার মাঝখানে থাকে জগদ্দল। যার জন্যই জগদ্দল ইঞ্জিনের ঢাকনা খুললে একরাশ ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করে। আবহসংগীতের সঙ্গে জগদ্দলের শব্দের একটা কাউন্টারপয়েন্ট চলে। সংগীতের সঙ্গে হাসির মুভমেন্ট একটা কাব্যিক মূর্ছনা আনে। জগদ্দলের রাগ হয় হাসি যখন বিমলকে অ্যাপ্রোচ করে। অনিলের ডাকে বিমল স্বস্তি পায়। এই ফাঁকে সুলতান গাড়ি নিয়ে পালায়। হাসি হাসিতে ফেটে পড়ে। হাসির উচ্ছ্বাস আর জগদ্দলের আর্তনাদ পরিচালক পরপর আনেন। বিমল একলাফে চলন্ত গাড়িতে উঠে পড়ে গাড়ি থামায়—ঠিক যখন প্রায় বসে-থাকা হাসির সামনে গাড়ি এসে পড়েছে। হাসির অভিব্যক্তিতে আমরা বুঝি, ও লজ্জিত হয়েছে। যেন যন্ত্রসভ্যতার কবলে এক অসহায় নারী যার মধ্যে হুড খুলে মুক্ত আকাশ দেখার বাসনা ছিল।

জগদ্দল আবার চলে। সুলতানের দুষ্টুমিভরা মুখ। আবহে আবার থিম মিউজিক। এবার বাঁশিতে। অনেক পরিমার্জিত এবং বিলম্বিত লয়ে শুনি। বিমল গাড়ির হুডটা নামানোর সময় ছেঁড়া অংশটা চোখে পড়ে। আবহে হাসি—বিমলের সংগীতটা শুরু হয়। সেই খামাজের অংশটা বিশেষ করে কানে লাগে। লক্ষণীয় যে, গাড়ির দরজা বিমল বন্ধ করতেই আবহ লো ভলিউমে শোনা যায়। উন্মুক্ত প্রকৃতির দিকে এখন বিমলের চোখ। বিমল গাড়ির ইঞ্জিনের ওপর বসে একটা বিড়ি ধরায়। আবহে সরোদে বিলাসখানি টোড়ি শুরু হয়।

কয়লাখনি ও অন্যান্য কারখানার দৃশ্য দেখা যায়। মাল বয়ে নিয়ে যায় উঁচুরেলে ট্রলি। এ দৃশ্যে আবহে কারখানার শব্দের বদলে আমরা শুনি একটা কম্পোজিশন সংগীত। রূপকের মতো এ অংশ আমাদের কাছে আসে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বিমল কলকাতার ট্রেন ধরিয়ে দেয় উর্ধ্বশ্বাসে—সময়, ট্রেন সবাইকে ছাড়িয়ে। জগদ্দলের পেছনে একটা ট্রাকে আদিবাসী মেয়েরা গান করতে করতে চলে। একটা দৃশ্যে দেখি দূরে রাস্তায় জগদ্দল আর ট্রাকের ধোঁয়া, আর সামনের মাঠে একটা ছোট্ট বাচ্চা বসে। বৃদ্ধ যখন বিমলকে ধন্যবাদ দিতে যান দেখেন বিমল জগদ্দলের সঙ্গে গল্প করছে।

পরের সিনে প্যারা সিং-এর সঙ্গে বিমলের গানের যুদ্ধ ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে।

প্যারা সিং-এর গান,

জেড়া আজ লোয়াকে দেউয়ে
কাঁচড়ীয়া চুড়িয়া
ও দেনাল হোন গিয়া কাগল্যাঁ
উড়িয়া

বিমলের গান,

কালো মেয়ের পায়ের তলায়....
রাতের ট্রেন স্টেশন। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড।
বিলম্বিত লয়ে বাঁশিতে সরোদে আবহসংগীত এরকম,

সা গ ম পঃম গ ম, ম গ সা গ সা
গ ম নি প ম গ ম ম, ম গ সা গ সা।

সকাল হয়। বিমল গাড়ি থেকে উঠে দেখে কোথায় রয়েছে। মন্দিরের সামনের মাঠে বাচ্চারা গাছের তলায় কাদা নিয়ে খেলা করছে। সেতারে আবহে আহির ভৈরবে আলাপ, যা প্রধানত বাৎসল্যকে ফুটিয়ে তোলে।

ছৌ নাচ।

মন্দিরের ঘণ্টা আর সেতারে আলাপ মিশে যায়। বিমল যখন ফুল নিয়ে মন্দিরে না-ঢুকে বেরিয়ে আসে তখন সরোদে শুরু হয় আহির ভৈরব। বিমল বাচ্চাদের জগদ্দলকে ঘাঁটাতে দেখে ছুটে আসে নীচে। বাচ্চারা কাদা ছুঁড়ে দেয় বিমলের মুখে। আবহে ছৌ-নাচের মাদল ধ্বনি। ব্যঙ্গাত্মক কপট বিবাহ দর্শন এখন মা-র শিশুকে মানুষ করার বোধে উন্নীত হয়। তাই দেখি ক্ষীণ জলের স্রোত নদীর ধারে, আর সেখান থেকে ক্যামেরা টিলট আপ্ করে দেখায় বিমল ও জগদ্দলকে। বিমল হাঁপায় পরিশ্রান্ত হয়ে। আবহে সরোদে বিলাসখানি টোড়ি বিমলের গুমড়ে-ওঠা মনকে মূর্ত করে। দিগন্তবিস্তৃত জলের পারাপার দেখা যায় না। বিমল বলে ওঠে, 'কুছ পরোয়া নেই জগদ্দল, তুই আর আমি আছি।'

টিলার ওপর হাসি বসে। বিমল তাকে দেখতে পায়। আবহে বিমল-হাসির সংগীত।

বিমল হাসির পোঁটলা সমেত হাসিকে গাড়িতে তোলে। আবহে থিম মিউজিক সরোদ ও সেতার যোগে, ধীরে। বিমল হাসিকে বলে, 'ওটা সেলাই করে দিয়েছি, পুরোনো হুডের কাপড়টা।' সেই আদিবাসী বাজারের পাশ দিয়ে ওরা পেরিয়ে যায়। স্বল্প মুহূর্তের জন্য আদিবাসী সংগীত আসে। আবার থিম মিউজিক অন্য চেহারায় ফিবে আসে। দেখা যায় উন্মুক্ত মাঠে ফসল কাটা রয়েছে একধারে আর বিমলের গাড়ি দূর থেকে ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটে আসছে।

ট্রেনের টিকিট কেটে বিমল যখন প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকায়, দূরে হাসিকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দ্যাখে। বিমল টিকিটটা হাতে নিয়ে হাঁটতে থাকে। আবহসংগীত শুরু হয় সরোদে। অনিরুদ্ধ বলছেন,

"এ সুর 'যাত্রা'-র প্রধান সুরেরই এক ঘনীভূত রূপ। এ সুর বিমলের মনে উদ্ভূত হাসির প্রতি সমবেদনার ও ভালোবাসার এক সংমিশ্রণ। রাগ কাফী সরোদে বেজেছে।"

অনিরুদ্ধ আরও বলছেন, "এখানে বিমল আর সকলের থেকে একা। এই প্ল্যাটফর্ম, লোকজন, ওর আর হাসির কোনো খেয়ালই নেই।"

সমস্ত যাত্রা ওখানে গিয়ে যেন একীভূত হল। হাসি চলে গেলে, বিমলের গাড়ি ওকে আর ধরতে পারল না। পোঁটলাটা দেওয়া হল না।

যন্ত্র বিকল হয়ে গেলে হঠাৎ বিমল শোনে মাদলের প্রতিধ্বনি। সমস্ত পাহাড় জঙ্গল ছাপিয়ে সে ধ্বনি যেন দাপিয়ে ওঠে। শিঙা হাতে মানুষ। বিমল নেমে আসে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওরাওঁ যাত্রার দিকে।

ওরাওঁ যাত্রার দুটি গান আমরা শুনি,

(১) দূরে নাল হাটিযা
নৌরঙ্গা বাণ ফুটালে যায় না
নৌরঙ্গা বাণ বাজালে
নৌরঙ্গা বাণ বাজালে যায় না

(২) কা হায় লিও দাদা তেলেঙ্গা
কা হায় রিও দাদা সাঙ্গেলা
বহু রিও দাদা তেলেঙ্গা
সমাড় রিও দাদা সাঙ্গেলা
বড়ু রিও দাদা তেলেঙ্গা
টামাড় রিও দাদা সাঙ্গেলা"

বুলাকি পাগলের গামলা চিপে যাওয়ার দৃশ্যে এই ওরাওঁ গান স্বল্পক্ষণের জন্য ফিরে আসে, যখন বিমল ভাঙা গাড়ি নিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ফিরে আসে।

মেঘভরা আকাশের নীচে বিমল সোজা ঘুরে আমাদের দিকে তাকায়, যখন ট্যাক্সি স্ট্যান্ড ভর্তি লোক সুলতানকে নিয়ে মশকরা করে। আবহে বিলাসখানি টোড়ি।

রাতের কবরস্থানে ওরাওঁ এক রমণী তার প্রয়াত সন্তানের কবর জড়িয়ে কাঁদে। গান,

নিঁদি নাস্তা কিড়া আইও
হৃদি হু ভিসিকার
আইও পার্জৌর মো গড়ে চার
কোমর খাখুরিয়া আইও
মাদাগী হো খতেরা
যর আইও হরে কিওন

বলেকান

গির্জার ঘণ্টায় রাত তিনটে শোনা যায়। বিমল লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে জগদ্দলের গ্যারেজে যায়। গান চলতে থাকে, সঙ্গে জগদ্দলের বিচিত্র আওয়াজ।

ভোর হলে বিমল স্ট্যান্ডে যায় গৌর মিস্ত্রির কাছে নতুন পার্টসের অর্ডার নিয়ে।

ফিরে এসে নতুন করে জগদ্দলের ইঞ্জিন সারানোয় মন দেয়। এসময়ে একটি কম্পোজিশন সংগীত শোনা যায়, যেখানে সেতার ও সরোদের সঙ্গে জলতরঙ্গের ব্যবহার লক্ষণীয়।

অনিরুদ্ধর ব্যাখ্যা,

"বিমল ও জগদ্দলের যে জীবনধারা, ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকে যে পথ চলা, সেই পথচলায় ছেদ পড়ে যখন জগদ্দলের ভিতরেব যন্ত্রসমষ্টি বয়সের ভারে জীর্ণ ও অক্ষম হয়ে পড়ে। বিমল একাকী সেই যন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তার মন আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান হয়ে পড়ে। তার এই মানসিক অবস্থা রাগ 'মারোয়া'য় রূপ পেয়েছে। অবশেষে সারারাত্রি পরিশ্রমের পর যখন তার মন জগদ্দলের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার আশায় সিঞ্চিত হতে থাকে তখন তাদের দুজনের পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষার মূর্ছনা ঘটে রাগ 'সোহিনী'তে।

পাহাড়ে আবার যখন জগদ্দল ওঠে তখন আবহে রাগ 'আশাবরী' বাজে সরোদে। জগদ্দলের যে অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে এ রাগ সেই ইঙ্গিত দেয়।

গির্জার ঘণ্টার আড়ালে দেখা যায় বিমল চাদর জড়িয়ে বসে। হাতে জগদ্দলের আয়নাটা। আবহে আদিবাসী রমণীদের সমবেত সংগীত শোনা যায়। মারোয়ারি ব্যাবসায়ীর কথোপকথনের সময় সংগীত সাময়িক স্তব্ধ হয়ে আবার শুরু হয়।

ভাঙা জগদ্দলের বনেটটার ওপর আবার আবহে বিলাসখানি টোড়ি ফিরে আসে।

বুলাকি পাগলের নতুন গামলা পাওয়ার আনন্দের সময় আমরা আবার শুনি থিম মিউজিক। ঠিক যেমন প্রথম দৃশ্যে যাত্রার আবহ বলে আমরা যাকে জানি—পরিমার্জিত এক আদিম সুর।

বিমল একমুঠো ধুলো তুলে নেয় গ্যারেজের ঘরে। স্প্যানারটা হাত থেকে পড়ে যায় জগদ্দলের ভাঙাচোরার শব্দে। আবহে বিলাসখানি টোড়ি।

বাচ্চার হর্নটেপার দৃশ্যে আবার স্বল্পক্ষণের জন্য বিলাসখানি টোড়ি ফিরে আসে। ফিরে আসে গির্জার ঘণ্টা, আর আদিবাসী রমণীদের সমবেত সংগীত—যেন নতুন ফসল ফলাতে চলেছে তারা। বিমলের কান্না-হাসি ভরা মুখে পরিপূর্ণতার স্বাদ। সবশেষে শুধু সমবেত মাদলের শব্দ।

সমস্ত দ্বন্দ্ব ও উৎকণ্ঠা পেরিয়ে 'অযান্ত্রিক' আমাদের একটা শান্ত ও শাশ্বতভাবে উন্নীত করে।

যে-শ্লেষ আর ব্যঙ্গ আমাদের হওয়া স্বাভাবিক প্রত্যন্ত মানুষের প্রতি তার দৃষ্টিকোণটি ঘুরিয়ে দিলেন উলটোদিকে। এখানে বিমলরা হচ্ছে অবজারভার। বৈচিত্র্যপূর্ণ যাত্রীদের আসাযাওয়া তারা লক্ষ করে। প্রথমেই আঘাত করলেন মধ্যবিত্ত শহুরে বাবুদের ব্যঙ্গাত্মক কপট বিবাহ-ইচ্ছাকে।

আমরা এও দেখতে পাই প্রতিটি যাত্রীর আসাযাওয়া বিমলের সংবেদনশীল মনে কী গভীর ছাপ ফেলে।

মামা-ভাগ্নেকে বিয়ের বাসরে পৌঁছে দিয়ে বিমলের মনে ভাব আসে নতুন পোশাকে নিজেকে এবং জগদ্দলকে সাফসুফ করে ফোটো তোলার বাসনা—এ শুধু বাঙালির তৎকালীন সামাজিক বিবাহ-ইচ্ছাকে ব্যঙ্গ করা হল না, নিজের চপলতাকে ওই বিচিত্র ট্যাক্সিস্ট্যান্ডবাসীদের সঙ্গে জারিয়ে নেওয়া হল।

প্রথম সিকোয়েন্স অবধি বিমল ওই প্যারা সিং, গৌর মিস্ত্রি, বুলাকি পাগল, দোকানি বউদির সুখদুঃখের সাথি। তারপরের সিকোয়েন্স থেকে বিমল হয়ে পড়ে একা। এ অবস্থাটা তলায় তলায় ঘটতে থাকে ওর মন্দিরে যাওয়ার সময় থেকে। বাচ্চাদের cruetly ওকে আরও একা করে দেয়। তখন ও আর জগদ্দল শুধু পৃথিবীতে—আর সামনের দিগন্তবিস্তৃত নদী, কখনও বা বনের সারি, বা পাহাড়ের ঢাল। বিমলের এই গভীর একাকিত্বের সময় হাসিকে পুনর্বার সে দেখতে পায়—যখন তারা একাকিত্বের দুই বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে।

বিমলের যাত্রার সব আনন্দ ঘনীভূত হয় ওই প্ল্যাটফর্মের দৃশ্যে যেখানে সে দূর থেকে দেখে হাসিকে। সঙ্গের আবহসংগীত আমাদের জানায় যাত্রার আনন্দের চপলতা। এখন ক্রমশ পরিণতি পেয়েছে এমন এক মাধুর্যে যেসব যাত্রা যেন এক বোধে উন্নীত হল (দুধের ঘন সর পড়ার মতো পরিমার্জিত এক আদিম সুর রাগ কাফীতে পরিণত হয়।) হাসিকে সমবেদনা জানায় বিমল তার বিচিত্র ভঙ্গিতে, কিন্তু আটকে রাখতে পারে কি? জগদ্দলও বিগড়োয় ঠিক এমনি সময়ে। তখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওরাওঁ যাত্রায় নেমে আসা ছাড়া ও আর কীই বা করতে পাবে।

মহাকালের এই ডাক (মাদলের বোলে) আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডবাসীদের কৌতুক তার কাছে কতটুকুই বা আঁচড় কাটতে পারে।

তাও বিমল আমাদের দিকে তাকায়। তার জীবনের নিষ্ঠায়, একাকিত্বে, তার কি কোনো ভুল থাকতে পারে? মৃতা মা, উপচে পড়া প্রকৃতি, আর তার গোপন মনে লালন করা প্রেম গুমরে ওঠে বিলাসখানি টোড়িতে; ঠিক যেমন দুমড়ে-মুচড়ে যায় আমাদের অস্তিত্ব ওরাওঁ রমণীর ক্রন্দন তার মৃত শিশুটির প্রতি যখন শুনি। বিমলের জগদ্দলের প্রতি ভালোবাসার সাযুজ্য পাই আমরা ক্রন্দনরতা রমণীর গানটির থেকে, তখন তো আমরা বিমলের মতোই অসহায়।

গ্যারেজের শিশুটি ছাড়া আর আমাদের অবলম্বন কীই বা থাকে।

নতুন আলোকে দেখা আনন্দ ঘনীভূত যাত্রার এই পরিসমাপ্তি আমরা মানতে পারি না।

বিমলের ব্যর্থ আশার তখন আমরাও সাথি।

কিন্তু নীতার যক্ষ্মার মতোই জগদ্দলের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিমল মেনে নিতে পারে না। আবার দিগ্‌ভ্রান্ত এক পাকা মিস্ত্রি গৌর মিস্ত্রির সচেতন চোখের মতোই উপলব্ধি করে জগদ্দলের মর্মস্থলের রোগ। নিয়ে যায় তাকে পাহাড়ের ঢালে।

নিজের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে যাকে সারিয়ে তোলা হয়েছিল তাকে বিদায় দিতে হয় সের দরে। এ আঘাতে সমস্ত কবরস্থান তো কেঁপে উঠবেই। নতুন সভ্যতার জন্ম হবে এক মৃত সভ্যতার ওপর।

বিমলের বৈরাগ্যের প্রাপ্তি তো ওই শিশুটিই, যে তাকে বহন করে নিয়ে যাবে নতুন সভ্যতার উষালগ্নে।

সে তো আরেক যন্ত্র মাত্র নয়!